

প্রবাসী শারদ সংখ্যা ২০২৫
তৃতীয় বর্ষ

কোচিকলা



Sila

HEATING
COOLING
PLUMBING
ELECTRICAL

SERVICE IN HOURS NOT DAYS

When something goes wrong at home, waiting isn't an option. That's why Sila delivers fast, reliable service—in hours—for all your plumbing, heating, cooling, electrical, and drain needs.

With expert technicians and a commitment to your comfort, Sila gets the job done right the first time—so your home is back to normal before the day is over.



CONTACT US
(781) 819-0510
webresponse-bos@sila.com
sila.com



HEATING - COOLING - ELECTRICAL - PLUMBING - DRAINS



**আশ্বিনের হাওয়ায় মা, তোমার আগমনী গান ভেসে আসে।
শিউলির গন্ধে ভরে ওঠে পথ, কাশফুলের দোলায় হাসে প্রান্তর।**

Dear Prabasi Community,

As the whisper of the autumn breeze evokes the eternal rhythm of tradition, Mahalaya's resonant strains of Mahishasurmardini awaken us once more to Maa Durga's Okalbodhon. The dhak beats, and the Chandi Path echoing in the crisp dawn air remind us of that sacred moment when the Goddess awakens and light triumphs over darkness.

It is with deep humility and joy that I welcome you all to this year's Durga Puja. Since its inception in 1969, Prabasi of New England has stood as a tilottama in Boston's cultural landscape - sustaining the flame of Bangaliana far from the banks of the Ganga. From the first Puja in 1975, lovingly organized by a small group of Bengali immigrants, our community has grown into one of the most vibrant cultural associations in the United States. What began as an intimate gathering of faith and devotion has blossomed into a celebration that unites thousands, weaving together art, music, spirituality, and fellowship.

Today, Durga Puja at Prabasi is more than an annual event - it is a homecoming. The sight of our majestic pratima idols from Kumartuli, the aroma of khichuri bhog, the rhythm of dhunuchi naach, the strains of Rabindra Sangeet, and the joyous laughter of children in the pandal remind us that Prabasi is not only an organization but truly a home away from home. It is where generations gather to celebrate tradition, reconnect with roots, and forge new bonds of friendship and belonging. Throughout the year, we have joined hands to uphold our heritage and nurture the spirit of togetherness.

This year we came together for Saraswati Puja and Kobi Jayanti, revived our beloved magazine Agomoni, supported the Acton Food Pantry in the spirit of seva, and enjoyed the summer sun amidst gales of laughter and games at our annual picnic. These gatherings were more than occasions to meet - they were ways of keeping our traditions alive and continuing the cultural legacy of Tagore, Nazrul, and Bengal. None of this would have been possible without the tireless efforts of our Executive Committee and the wholehearted and unwavering participation of each member.

This year's Puja theme, Roots and Ray-Senonce, celebrates both the rustic simplicity of gram Bangla and the universal resonance of Satyajit Ray's creations. Our mandap, lovingly crafted by member-artists and engineers, incorporates village motifs that honor the strength and resilience of our roots, while reflecting the eternal shakti of the feminine spirit that sustains creation and inspires transformation. In parallel, our collaboration with the Museum of Fine Arts ensures that Bengal's devotional and artistic traditions continue to shine brightly, affirming the enduring resonance of Bengal's roots on the global stage.

We take great pride in nurturing the next generation of our community. This year, the Shanta Poddar Memorial Scholarship was awarded to Rohan Devprasad Datta, whose pursuit of advanced data analytics and computer engineering is shaped by an inventive mind and a steadfast commitment to service. His journey embodies the spirit of Prabasi - where innovation remains anchored in tradition, and knowledge is enriched by cultural pride.

As we celebrate in prayer, music, art, and togetherness, let us remember that Prabasi is not bound by geography but by bandhutva (friendship) and sampriti (unity). Whether you have been with us since 1975 or have only recently joined, your presence enriches our community and strengthens the ties that make us whole.

On behalf of the Executive Committee, I extend my deepest gratitude for your support, your seva, and your spirit. May Maa Durga bless every household with courage, compassion, and joy, and may her divine energy continue to guide Prabasi toward unity, creativity, and cultural pride.

শুভ বিজয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা।



With warm regards and deep gratitude,
Dr. Pubali Banerjee
President, Prabasi of New England



Agomoni



Prabasi Executive committee - 2025



Dr. Pubali Banerjee
President



Anindya Tapaswi
Treasurer



Sameer Chakraborty
Vice President



Devprasad Dutta
Secretary



Shouvik Chakraborty
Executive Director



Shounak Mukherjee
Executive Director



Sudeshna Basu
Executive Director

Prabasi Magazine committee - 2025



Patralekha Das



Lopamudra Sen



Paramita Dutta



Moumita Banerjee

সূচিপত্র

1. *Hajar bochorer purono pujo*
Dipankar Sen

4. *Kahini kolpona noi*
Proloy som

10. *Abhiman*
Manju Pramanik

11. *A night that lead to an incredible dawn*
Soumi Mukhopadhyay

16. *Aj Dasami*
Gaurav Mukherjee

20. *Tanaporen*
Shounak Mukherjee

25. *I Called It My Alma Mater – Until That Night*
Indrani Bhattacharjee, MD

28. *Jibon smriti*
Madhushree Majumdar

32. *Rag korona raguni*
Swapna Ray

37. *But what is Shaktism, really?*
Aritra Ghosh

42. *Six Yards of Memory*
Jayati (Das) Sadhukhan

45. *Ma Durga has a smartphone*
Samrita Roy - 9 years

46. *Chobi ankar manushera*
Rahul Ray

48. *Surjaste surjodoy*
Maitreyee sen

51. *Ekta chotto obhiggota*
Babiya Chanda

52. *Owl Art of Bengal*
Rajarshi

53. *Happy Sunshine*
Srijita Dutta

53. *Choto der Prabasi*
Suhaz Barua

54. *Sophie's Beautiful World*
Maitreyi Sophie Sen - 7 Grade

54. *Laughing Through Lockdown*
Kaushiki Banerjee - 11 Grade

55. *I am From...*
Maitreyi Sophie Sen - 7 Grade

A Day With Maa Durga In Boston..

56. *Adhrit Mukhejee, Grade 2*
Aishani Ghoshal, Grade 4

58. *Arisha Ghosh, Grade 5*

60. *Pujor rate ekta ajob ghotona.*
Riana Banerjee, Grade 7

61. *Summit to Summit in the White Mountains*
Ayyan Das, Grade 8

65. *Amar Masai Mara Abhijan*
Akashnil Chanda, Grade 9

72. *I Am Not Born to be Deaf*
Aurkodeep Chanda, Grade 5

75. *Amra shobai chhilam raja*
Priyadarshini Dasgupta

76. *The Life Of A Troubled Genius:*
Robert James Fischer
Maitreya Ganguly, Grade 8

79. *Adventure in Patagonia: Memories*
from my backpacking trip
Shaunak Sasmal, Grade 8

86. *Lights, Dhaak, and Darun Days*
Aheer Bose, Age 7

87. *Asurer school*
Driti Choudhury, Age 7

88. *Life at MASS (Mahishashur*
Academy of Social Skills)
Mayukh Gupta, Age 10

91. *Tech Updates*
Amartya Haldar, Grade 6

93. *Prabasir Rannaghor*
Rosogolla

95 - 97
Kids' Creations

Cover Page :
Avni Pal, Grade 4

HEARTFELT GRATITUDE TO OUR 2024 SPONSORS

- *Anindya (Andy) Tapaswi*
- *Atanu Roy*
- *Avijit Chaterjee*
- *Bhaswati Ghosh*
- *Bibrata Deb*
- *Dipanjan Halder*
- *Indra Deb*
- *Nandakumar govindaswamy*
- *Narendra Roy*
- *Pralay Som*
- *Ramkrishna Chakrabarty*
- *Pubali Banerjee*
- *Rita Sengupta*
- *Sameer Chakraborty*
- *Sanchayan Dutta*
- *Satya Mitra*
- *Sharbari Ganguly*
- *Shikha Barman*
- *Sima Santra*
- *Songhita Das*
- *Soumen Das*



মা আসছেন!

সম্পাদকীয়

এই একটি শব্দেই যেন শরতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠের চণ্ডীপাঠ কানে এলেই এক অজানা পুলক শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এই দিনটির জন্যই তো গোটা বছর প্রতীক্ষায় থাকি আমরা, যারা দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে নিজেদের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছি। বছরের এই সময়টার জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। কারণ দুর্গাপূজা শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের আবেগ, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি।



দেশের দুর্গাপূজা আর প্রবাসের দুর্গাপূজার মধ্যে পার্থক্য আছে, তা আমরা সবাই জানি। সেখানে পূজা মানে গোটা শহরের এক হয়ে যাওয়া, মাইকের আওয়াজে কান পাতা দায়, পাড়ায় পাড়ায় থিমের লড়াই, আর গোটা রাত ধরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা। ভোরবেলার হালকা শীতে ঢাকের শব্দে ঘুম ভাঙা, আর একরাশ নতুন শাড়ি-পাঞ্জাবির গন্ধ।

আর এখানে? স্কুল বা অফিসের ছুটি নেই, পাড়ার মোড়ে মোড়ে প্যান্ডেলও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রবাসের দুর্গাপূজায় আছে এক অন্যরকম আন্তরিকতার স্বাদ। এটি যেন এক বৃহৎ পারিবারিক মিলনমেলা। এখানে প্যান্ডেল হয়তো কোনো কমিউনিটি স্কুল। কিন্তু সেখানেই তৈরি হয় এক টুকরো কলকাতা। এই পূজায় শুধু ধর্ম নয়, সংস্কৃতিও একত্রিত হয়। অঞ্জলি, আরতি, এরপর ভোগ, ধুনি নাচ - সব কিছুই হয় নিয়ম মেনে। এর ফাঁকে চলে অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এবছরেও অসাধারণ মণ্ডপ সজ্জা, মায়ের অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা, নানা রঙের শাড়ি-পাঞ্জাবি, গয়নার স্টল, ঢাকের বাদ্যি আর শিশুদের কলরবে "প্রবাসী"র পূজা প্রাঙ্গণ এখন উৎসবমুখর। পরিচিত-অপরিচিতের ভেদাভেদ মুছে গিয়ে সবাই হয়ে উঠেছে এক বিশাল পরিবারের সদস্য।

এবার যাই একটু শাস্ত্র কোথায়। এবছর দেবীর আগমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্ত্র অনুযায়ী, মা দুর্গা যখন হস্তীর পিঠে চড়ে মর্ত্যে আসেন, তখন তা পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। গজরাজ যেন তার গুঁড়ে ভরে নিয়ে আসে আনন্দ আর কল্যাণের বার্তা। আমাদের চারপাশে যখন নানা ধরনের প্রতিকূলতা, তখন মায়ের গজে আগমন এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এটি যেন মায়ের পক্ষ থেকে এক অভয়বাণী, যে সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যাবে এবং আবারও শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। এই বিশ্বাস আমাদের মনে সাহস যোগায় এবং সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার শক্তি প্রদান করে।

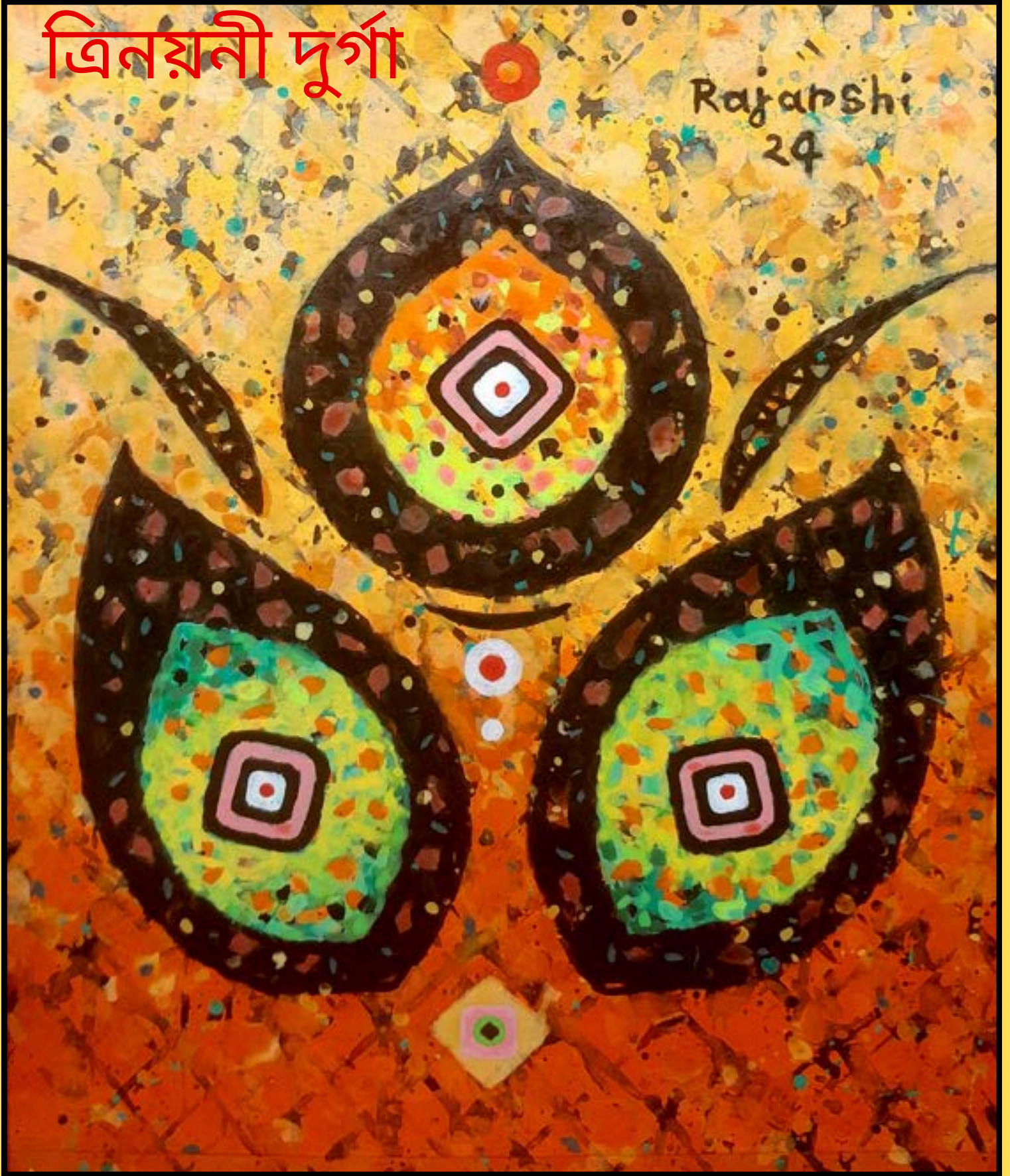
আবার যখন বিদায়ের ঘণ্টা বাজে, তখন মন খারাপের মেঘ ঘনিয়ে আসে। এবার মা দুর্গা দোলায় চড়ে কৈলাসে ফিরে যাচ্ছেন। দেবীর এই যাত্রাপথ সব বাঙালির মনে এক গভীর বিষণ্ণতা রেখে যায়। তবে এই বিষাদের মধ্যেও থাকে আগামী বছরের প্রতীক্ষা। "মা আবার এসো!" - এই আশা নিয়েই আমরা দেবীকে বিদায় জানাই। আমরা "আগমনী" টিমের পক্ষ থেকে কামনা করি, মা দুর্গা সকলের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। "প্রবাসী"র সকল সদস্য ও দর্শনার্থীদের জানাই আন্তরিক শারদীয় শুভেচ্ছা!

শুভ হোক এবারের দুর্গাপূজা!

পত্রলেখা দাস

ত্রিনয়নী দুর্গা

Rajanshi
24



হাজার বছরের পুরোনো পুজো

দীপঙ্কর সেন

সময়টা হাজার বছর আগের। এক অশ্বারূঢ় রাজপুরুষ বিশ্বস্ত সঙ্গী সহ জঙ্গলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। না এটা ঠিক মৃগয়া নয়, তবে শিকারের বাসনা আছে। সামনে বিশাল এক ঘন জঙ্গল। ঘোড়া থেকে নেমে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকালেন। জঙ্গলে কোথাও কোথাও বিশাল বৃক্ষ আর তাদের পত্ররাজি এতটাই ঘন যে সূর্যের আলোও পৌঁছতে পারেনা। এখন অবশ্য মধ্যাহ্ন। বর্ষার আকাশও আজ মেঘশূন্য। রাজপুরুষ সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একাই জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। রইলো সঙ্গী বলতে নিজের পোষা শিকারি বাজপাখি। জঙ্গলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এক ঘন নীরবতা।

শব্দ বলতে শুষ্ক পাতার খসখসানি। কোথাও আবার ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলোর লুকোচুরি খেলা। রাজপুরুষ থামলেন। বুঝলেন পথ হারিয়েছেন। তখনই কিছু একটা যেন সরে গেল। অদম্য সাহসী, বিশালাকায় রাজপুরুষ আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। এবার সরাসরি নজরে পড়ল এক সুদৃশ্য হরিণী। এত সুন্দর, মায়াময়, তাই কলক্ষেপ না করে দ্রুতবেগে তার পিছু ধাওয়া করলেন।



রাজপুরুষ নিশির ডাকের মতো ছুটে চলেছেন। পথ হারানোর গোলক ধাঁধায় আরও জড়িয়ে ফেললেন। ঝুঁকে থাকা অনেক পাতার ঝোপে হঠাৎ করেই হারিয়ে গেলো। সেই হরিণী, আর তো দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেলো? বিস্ময় কাটতেই নজরে এলো সাথে বাজপাখি তাড়া করেছে একটা বগলা পাখিকে। জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়লেও রাজপুরুষ এবার বাজপাখিকেই অনুসরণ করলেন। এবার বিস্ময়ের উল্টোদিক। সূর্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি-তে দেখা গেলো বগলা পাখিটাই বাজপাখিকে তাড়া করেছে। বিস্ময়, শুধুই বিস্ময়। জঙ্গলের ঘন আঁধার যে জায়গাটা জুড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে এক অসামান্য সুন্দরী নারী।

কে মা তুমি?

এক ঘনঘোর নীরবতা। অন্ধকার পায়ে পায়ে জঙ্গল ছেয়ে ফেলেছে। এক সুনির্দিষ্ট বাণী এই ঘন জঙ্গলের বৃক্ষ পল্লবে প্রতিধ্বনিত হলো - 'শোনো রাজা, তোমার কর্মকাণ্ডে, প্রজা বৎসলতায় আমি খুশি হয়েছি। এবার তোমার রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করো। এখানেই খনন করে আমার এক ক্ষুদ্র মূর্তি পাবে। এখানে মন্দির স্থাপন করবে। আমার পুজো করবে'। অদম্য সাহসী সেই রাজপুরুষ ভূমিতলে বসে জোড় হস্তে সেই মাতৃমূর্তির দিকে চেয়ে আছেন। ভিত সন্ত্রস্ত বাজ পাখিও মনিবের কাছে ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারের ঘনত্ব বাড়ছে। পাখিরাও অনেকক্ষণ আগে নীড়ে ফিরছে। বাজ পাখির ডাক শুনে সঙ্গী দুজন এবার উৎকণ্ঠায় মনিবের খোঁজে জঙ্গলে প্রবেশ করল। কী অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বাজ পাখিই তাদের নিয়ে এলো সেখানে যেখানে তিনি এক বৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

চোখ দুটো বন্ধ। সঙ্গীরা তাদের উপস্থিতি জানাতে তিনি তাকালেন। তাদের অনুসরণ করে জঙ্গলের বাইরে এলেন।

যে রাজপুরুষের কথা বলছি তিনি মল্ল রাজবংশের উত্তরাধিকারী জগৎ মল্ল। মল্লভূমের রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর। বিশাল রাজ প্রাসাদ। রাজা অন্দর মহলে গেলেন, রানীমা রোজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শিকার থেকে ফেরা ইস্তক জগৎ মল্ল কী এক চিন্তায় ব্যাপ্ত। রাজ বংশের দেবীমাতা মা বিশালাক্ষীকে তাঁর মনের কথা সব জানিয়েছেন। এবার মহারানীকে জানালেন মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা। কিছুটা হালকা হওয়া গেলো। রানীমা দুটো হাত জড়ো করে মাথায় রেখে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আর কালবিলম্ব নয়, কাল থেকেই শুরু মাতৃ আদেশ পূর্ণ করার কাজ। প্রদ্যুম্নপুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ওই জঙ্গল এলাকাটা। স্থানীয়ভাবে জায়গাটার নাম বিষ্ণুপুর। রাজা মায়ের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী শুরু করলেন নতুন রাজধানী নির্মাণ। প্রজা-বৎসল রাজা নিজেই পৌঁছে গেলেন সেই বট গাছের তলায়, যেখানে পেয়েছিলেন স্বপ্নাদেশ। এখানেই আছে মায়ের নির্দেশিত মূর্তি। রাজা এক বিষম ঘোরের মধ্যে। যুক্তি নয় এক অসীম বিশ্বাসের অনুভূতি শুধু রাজা নয় সব স্তরের প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। সন্তর্পণে খনন করে পাওয়া গেলো মূর্তি। রাজা ভাবে বিভোর। এই মূর্তি থেকে রূপ দেওয়া হলো মা মৃন্ময়ীর। আনা হলো গঙ্গা মাটি। পুরো ডোম কাজ শুরু হলো।



ফিরে এলেন প্রদ্যুম্নপুরে, অনেক রাজকার্যও বাকি। ওদিকে রাজধানী নির্মাণের সাথে সাথে গড়ে উঠছে মায়ের মন্দির। জগৎ মল্ল ডেকে পাঠিয়েছেন রাজপুরোহিতকে। মায়ের পূজা কিভাবে হবে, কোন পুরাণ মতে। রাজপুরোহিত আরও কয়েকজন শাস্ত্রবিদকে নিয়ে এসেছেন। তারা খবর নিয়ে এসেছে সর্বত্র কালিকা পুরাণ মতেই পূজো হয় তাই এখানেও সেটা হোক। কিন্তু এ তো মল্ল রাজপরিবারের পূজো, সবার থেকে একটু আলাদা হলে ভালো হয়। বিচক্ষণ রাজপুরোহিত মল্ল বংশের জন্য নতুন পুরাণের প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন।



সেটা সম্ভব নয়, তাই অনেক পুঁথি ঘেঁটে তৈরি হলো নতুন পুঁথি বলিনারায়ণী পুঁথি। মল্ল রাজবংশের উনিশতম রাজা জগৎ মল্ল আজ ইতিহাস তৈরির মুখে, সাক্ষী সমগ্র প্রজাগণ। একদিকে মল্লভূম রাজ্যের নতুন রাজধানী বিষ্ণুপুর অন্যদিকে মায়ের নতুন লীলক্ষেত্র মায়ের মন্দির। যে মূর্তি পাওয়া গেল তা ছিল মাটির, তাই নাম হলো মৃন্ময়ী মন্দির। রাজা জগৎ মল্ল জোর দিয়ে জানালেন দশমীতে মৃন্ময়ী মূর্তি ভাসান হবে না। তাহলে? একটা সমাধান তো দরকার। কিন্তু আর তো তর সয় না, অন্দর মহলের সাথে সাথে রাজাও চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। পুরোহিতদের নিয়ম নীতিও হলো অন্যরকম। শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের দল দিবারাত্র আলোচনা করে রাজাকে জানিয়ে দিলেন সুন্দর এক সমাধান।

মহালয়ার আগের নবমী তিথিতে অর্থাৎ জিতাষ্টমীর পরের দিন থেকে শুরু হয়ে যাবে পূজো। রাজ্যের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়ল পূজোর আনন্দ। ছড়িয়ে পড়ল স্বপ্নাদেশের কথা। কেমন ধারা পূজো?

মন্দিরে মায়ের মূর্তী। আর বাইরে দরবার সংলগ্ন গোপাল সায়রে স্নান সেরে মাকে আনা হবে মন্দিরে। ইনি বড় ঠাকুরানি অর্থাৎ মহাকালী। আবার দেবী পঙ্কের চতুর্থীতে আনা হবে মেজ ঠাকুরানি বা মহা লক্ষ্মীকে। আর মহা সপ্তমীতে আনা হবে ছোট ঠাকুরানি অর্থাৎ মহা সরস্বতী। এই তিন ঠাকুরানি কোন মূর্তি নয়, হবে পটে আঁকা ছবি। পূজো সব নিয়ম মতে। মল্ল বংশ শাক্ত ধারায় বিশ্বাসী, আছেন দেবী বিশালাক্ষী। তাই দেবী পূজোর সাথে দেবী মহাকালী, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর পূজো।



দুর্গা পূজার প্রতিটা দিন সেই রাজপুরুষ বিনম্র চিত্তে মায়ের মূর্তীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুধু শব্দ ব্রহ্ম এই বিশ্বাসে মূর্ছা পাহাড় থেকে রাজ কামান গর্জে উঠল বিশেষ বিশেষ ক্ষণে - সুদূর অঞ্চলের মানুষকে অবহিত করার জন্য। সন্ধিপূজোয় বলি নির্ধারিত। নিশ্চিত রাজা জগৎ মল্ল। নিশ্চিত প্রজাগন, মহা জাগতিক আনন্দ স্বপ্নে বিভোর সমগ্র রাজ্যবাসী। মহা দশমীর দিন বিপুল সমারোহে সব পটচিত্র বিসর্জিত হলো। সে এক মহাজাগতিক উৎসব। রাজপথে মশাল আলো, কোথাও বা ফুল দিয়ে সাজানো অনেক তোরণ।



এরপর কেটে গেছে অনেকটা সময়। আমার গল্পের পাত্ররা ইতিহাস হয়ে গেছেন। ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর দেওয়ালে আজও কান পাতলে শোনা যাবে সেদিনের উচ্ছ্বাস। মল্ল বংশের উত্তরাধিকারীরা সময়ে সময়ে যোগ করলেন আরও অনেক ব্যবস্থা। ১০২৯ বছর ধরে সেই একই নিয়মে আজও পূজিত হয়ে চলেছেন মা মূর্তী। মল্ল রাজ বংশে এই পূজোতে বীর হাঙ্গিরের আগে পশুবলি হতো, পরে আর হয় না। কারণ হাঙ্গির বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। আজও মূর্ছা পাহাড় থেকে কামান দাগা হয়, বিশেষ করে সন্ধি পূজার সময়। পট চিত্র এখনও আঁকা হয়। কবে শুরু জানা যায়নি, তবে দশমী, একাদশী দ্বাদশী ঘিরে আজও উৎসব হয়। দশমীতে কুম্ভকর্ণ বধ, একাদশীতে ইন্দ্রজিৎ ও দ্বাদশিতে রাবণ বধ দিয়ে শেষ হয় পূজা উৎসব। সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু বদলেছে, বদলায়নি পূজাকে জড়িয়ে আচার আর বিশ্বাসের যুগলবন্দী। পূজোর এই দিনগুলোর মাঝে - হয়তো বা মা মূর্তী থেকে চিন্ময়ী হয়ে যান।

(লোককথা নিয়ে গল্প বলা, কতটা ইতিহাস নির্ভর জানা নেই)



কল্পনা

লক্ষ্মী থেকে কিছু দূরে মীরপুর। ছোট্ট এক গ্রাম। লোকাল ট্রেনে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগে। মাঝে তিনটে স্টেশন। বাসরাস্তার উপরে একটা চায়ের দোকান। প্রায় প্রতিদিনই সকালে স্থানীয় কয়েকজনের জমায়েত হয় বাইরের দুটো বেঞ্চিতে। তাদের মধ্যে থাকে দিনমজুর, চাষী ও ব্যবসাদার। চায়ের সাথে একটু টা, আর ধূমপান করবে, তারপর যে যার কাজে যাবে। কখনো কখনো দুয়েকজন অজানা পথিক এসে বসে, অন্যদের কথা আর গল্পের মধ্যে টিপ্পনি কাটে। তাতে যাত্রার একঘেয়েমি কিছুটা কাটে।

আর আসে ইয়াসিন, স্থানীয়দের তুলনায় কিছুটা বয়স্ক। পৃথিবীর নানা সমস্যার সমাধান করার কারুরই বিশেষ আগ্রহ নেই, সময়ও নেই। তবে দেশ বিদেশের কিছু খবরাখবর যে তারা রাখেনা সেটা বলা ভুল। মোবাইল তো সবারই আছে, আর টিভিও প্রায় সকলেরই বাড়িতে যদিও খেলা আর কিছু সিরিয়াল দেখা ছাড়া টিভির যে আর কোনরকম প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা কারো মনে হয়না।

ইয়াসিন আসে আর ধীরেসুস্থে বসে। তার কাজে যাবার কোনরকম চিন্তা নেই। ঘরে তার মন টেকেনা। আর টিকবেই বা কেন? তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবি নাদিরা, বয়সে বাইস বৎসের তফাৎ। যেমন চটপটে আর তেমনি ছটফটে। প্রতি সপ্তাহে ছয় দিন শহরে যাতায়াত করে। এক পার্লারে কাজ করে। শোনা যায় সে নাকি ভাল রোজগার করে। আর তার থেকেও ভাল সে সাজগোজ করে। আশেপাশে লোকজন তাকে নিয়ে আড়ালে নানারকম রসালো কথা বলে। ইয়াসিন ওসব শুনেও শোনেনা। মরদকে বেশ আরামে রেখেছে, তাকে কাজে যেতে হয়না। নিল্দুকদের হিংসা হয়, সেটাই স্বাভাবিক। ওদের কথায় সে কান দেয়না।

এছাড়া ইয়াসিন নিজেও খুব করিৎকর্মা লোক। কিছু চাষের জমিজমা আছে। আগে নিজেই চাষবাস করতো, এখন বয়স হয়েছে। আর তাছাড়া বেশ কিছু সঞ্চয়ও হয়েছে। এখন অন্যদের দিয়ে চাষ করায়। ব্যবসায় বুদ্ধিও ভালই। তিনটে বলদ (ষাঁড়) রেখেছে, ভাড়া খাটায়। অন্য চাষাদের বলে, “ম্যায় তো মেরে বৈলোকো কিরায়ে মে লগাতা হুঁ। বহুৎ মজবুত ঔর তেজি হ্যায় মেরে বৈলোঁ।” বিশ্বাসযোগ্য কথা, তাই যে চাষাদের প্রয়োজন তারা ভাল দাম দেয় ইয়াসিনকে। এছাড়া ইয়াসিনের আরও খদ্দের আছে। অনেক গো-কুলে মাঝে মধ্যে বলদসহ ইয়াসিনের ডাক পড়ে। বারোমাস একটি বলদ পোষার বদলে প্রয়োজনে ভাড়া করাই তাহারা সমীচিন মনে করে। ইয়াসিনও তা জানে, তাই খদ্দেরের চিন্তা তাকে করতে হয়না।

নানান কথার মধ্যে প্রসাদ, একজন নবীন, বলে উঠলো “আরে আমরিকামে যো রাজা হ্যায় না উ তো বহুৎ খতরনাক্ আদমি হ্যায়।” কথা শেষ না হতেই হরদয়াল, আর এক নবীন, বলে উঠলো “অরে বাৎ তো উও এক মহারাজা কে মাফিক করতা হ্যায় লেকিন রাজা নহী হ্যায়, উনকো পার্সিদেরন কথা যাতা হ্যায়। উও রাজা জ্যায়সা মুকুট ভী নহী পহেনতা, বন্ধে কিরকেট খিলাড়ী কা মাফিক টোপী পহেনতা হ্যায়।” সবাই কী সব কিছু জানে? আরেকজন জিগ্নেস করলো। “তুনে উনকো খতরনাক কিঁউ বোলা?” উত্তরে এলো “কিঁয়ু না বোলু? উসনে তো ধমকি দিয়া কি দো এক দেশ ঔর এক সমুন্দর পানি নালা কো লে লেগা। ভলে সে ভলা দে দো, নহী তো জবরদস্তি সে। ঔর চিনা কো তো উও একদম পসন্দ নহী করতা হ্যায়। ‘দুতিনজনে মাথা নাড়িয়ে বললো ‘অরে ইয়ে সব তো অচ্ছি বাত নহী হ্যায়।’ ইয়াসিন অনেকক্ষন শুনেছে। আর কিছু না বলে সে থাকতে পারলোনা। বললো “আরে শুনো। উও তো অচ্ছা ইনসান হ্যায়।

ম্যায়নে শুনা উও দুনিয়া মে হরেক দেশকো তারিফ করতা হ্যায়। কোই উনকো গুস্তা করবায়ে তো তারিফ বড়তা রহতা হ্যায়। হমারে মোদিজীসে উনকা দোস্তি হ্যায়। ইয়ে তো হমারে দেশ কে লিয়ে বহৎ অচ্ছি বাত হ্যায় না?“ তার কথায় সকলেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। ইয়াসিনের হাতে তো অনেক সময়। এত তাড়াতারি সভা ভঙ্গ হলে পৃথিবীর অনেক খবর সে যে রাখে সেসব কে শুনবে? বললো “অরে ম্যায়নে তো ঔর শুনা পুৎনানে (মহাভারতে কংশের ভগ্নি) এক মরদ কে শকল মে লৌট আই এক বড়া দেশমে। শুনা উও তো অভি জবরদস্তিসে এক দেশকো লেনে কি কোশিষ কর রহা হ্যায়। হ্যয় আল্লা বহত লোগোঁ তো মারে যা রহে”। কোনো কাজ হোলোনা। ইয়াসিন আরও কিছু চিন্তা করার আগেই এক দিনমজুর বললো “অরে কামমে চলো ভাই, নহিতো প্যায়সা নহি মিলেগা।“ যদিও বা দেশ বিদেশের অনেক খবর রাখে এরা, কিন্তু কাজে যাবার সময় তো হয়ে গেছে। চায়ের আড্ডা ভাঙ্গতেই হোলো।

কাহিনী:

এ কাহিনী কল্পনা নয়। স্মৃতির ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু ঐতিহাসিক, সত্য ঘটনা ও আত্মকথার মিশ্রণ এই কাহিনীতে। স্থানঃ মীরাট, রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। সময়ঃ ভারত স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণ

১৯৪৩ সাল। পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায় তখন চরম দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের (বাংলা ১৩৫০ সাল) মন্বন্তরের মর্মান্তিক স্মৃতি আজ শুধু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে থাকার কথা। কিন্তু ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্য তার সাক্ষী। বাংলা চলচিত্রের গৌরব সত্যজিৎ রায় তার কিছুটা প্রদর্শন করেছেন ‘অশনি সংকেত’ চলচিত্রে। আমার বাবা, নিজের পরিবারের দায়িত্বসহ এক যুবক তখন। দুর্ভিক্ষের পরিণাম এবং কবে, কোথায় যে তার শেষ সবই অজানা। অতি বিত্তশালি ছিল পূর্ব বাংলায় ফরিদপুর জেলার ‘সোম’ পরিবার। সেই যৌথ পরিবাবের সাম্বল্যকে উপেক্ষা করে আমার বাবা যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (Indian Army)। ১৯৪৩ সালে আমার জন্মস্থান পূর্ব

বাংলাকে চিরদিনের জন্য পিছনে রেখে চলে এসেছিলাম সোজাসুজি দিল্লি। রাজধানী দিল্লি। তবে স্বাধীন ভারতবর্ষের নয়, অবিভক্ত ভারত ছিল পরাধীন, ইংরেজের অধিকারে ও শাসনে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিছুই ছিলনা। আমরা ছিলাম ইংরেজ রাজত্বের প্রজা, আমাদের রাজা তখন ষষ্ঠ জর্জ (King George VI)। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মস্থানবদল ছিল এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। একদিন কাজের থেকে ফিরে, পোষাক বদল করে আমাদের সাথে বসে ঘোষণা করলেন তাঁর সদ্য প্রাপ্ত বদলির আদেশের কথা। যেতে হবে মীরাটে, সপরিবারে। তিন বৎসর দিল্লিতে থাকার পরে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা মীরাটে এসেছিলাম। মীরাট ছিল UP-র (তখনকার United Province, পরবর্তিকালে উত্তর প্রদেশ) মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। স্বাধীনতার পূর্বেও এবং পরেও। দুটো অঞ্চল ছিল সেখানে, একটি মীরাট cantonment (হিন্দিতে ‘মেরঠ ছাওনী’) অন্যটি মীরাট city (হিন্দিতে ‘মেরঠ সদর’)। আমরা cantonment অঞ্চলেই ছিলাম।

আরম্ভ হয়েছিল নুতন স্থানে আবার আমাদের নুতন জীবনযাত্রা। কত একরের বিস্তীর্ণ যায়গা যে ছিল তা জানিনি অথবা মনে নেই। তবে সদর রাস্তার উপরে আনুমানিক পাঁচ ফুট উঁচু ইঁটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, তাতে প্রবেশের ও নিকাশের জন্য দুটো চওড়া লোহার গেট, এই নিয়ে ছিল একটা কম্পাউন্ড। এই কম্পাউন্ডের মধ্যে ছিল পাঁচটি একতলা দালানবাড়ি, কিছুটা দূরে দূরে, এছাড়া ছিল দ্বারোয়ান, চাষি, ধোপা, সহিস এদের সকলের জন্য কয়েকটি কুঁড়েঘর, অশ্বশালা, গোশালা, খেলার যোগ্য একটি মাঠ, আর একটি খেত যেখানে অনেক ফসল ফলানো হতো। একটি দালানবাড়িতে থাকতেন এক প্রৌঢ় ইংরেজ ব্যারিস্টার, যিনি ভারত স্বাধীন হবার পরেও ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করেননি। বিশ্বাস করতেন যে ভারতই তাঁর দেশ। তাঁর দালানটির সামনে ও একপাশে ছিল বিস্তীর্ণ ফলের বাগান। কাছের দালানবাড়িটির অর্ধেকটি ছিল আমাদের বাসস্থান। অন্য অর্ধেকে থাকতেন আমাদের বাড়িওয়ালার, জৈন সম্প্রদায়ের এক পরিবার।

তখনকার জীবনযাত্রার বর্ণনা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য। বাড়িতে, রাস্তায়, দোকানে, স্কুলে কোথাও electricity ছিলনা। টেলিভিশান, রেডিও যে ছিলনা তা বলাই বাহুল্য। ব্যাটারি চালিত transistor রেডিও মুষ্টিমেয় দু'এক জনের ছিল। তাই দেশবিদেশের খবরাখবরের জন্য সংবাদপত্রই ছিল সাধারণের একমাত্র ভরসা। ঘরে ঘরে টেলিফোন ছিলনা। মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কারো সাথে যোগাযোগ করা যেত একমাত্র হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রতি ঘরে দু'টি জিনিস অপরিহার্য ছিল, কেরোসিন আর কয়লা। ঘরে আলোর জন্য কেরোসিনের লণ্ঠন, এবং রান্নার জন্য কয়লার উনুন অথবা কেরোসিনের স্টোভ, এসব ছাড়া সাধারণের জীবন অচল ছিল। ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চাপাতি (কুটি) আর উদ্বৃত্ত ভাতে জল ঢেলে রাখা ছাড়া সব রান্না নতুন করে রাঁধতে হতো।

দিল্লিতে থাকাকালে সেখানে প্রাথমিক স্কুলের অভাব ছিল। আমাদের পুঁথিগত শিক্ষা তাই গৃহশিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মীরাটে বাসস্থান থেকে অনতিদূরে ছিল দু'টি স্কুল, দুটিই হাই স্কুল যেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো। সদর রাস্তার উপরে, আমাদের বাসস্থান থেকে মাত্র দুই মিনিটের হাঁটাপথে ছিল দুর্গাবাড়ি গার্লস্ হাই স্কুল। সেখানে ছেলেদের ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ দেয়া হতো যদিও প্রতিটি শ্রেণিতে থাকতো মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছেলে। আজ থেকে ৮০ বছরেরও আগে সেই সময় মীরাটে ছেলেদের ও মেয়েদের সহপাঠের সুযোগ দেয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। আর ছিল বাসস্থান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে Cantonment Anglo Bengali (CAB) হাই স্কুল। বাসস্থানের এত কাছে থাকায় দুর্গাবাড়ি স্কুলেই আমার দাদা আর আমি শুরু করেছিলাম জীবনে আমাদের প্রথম স্কুলজীবন, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে দু'ভাই স্কুলবদল করেছিলাম CAB স্কুলে। দুটি স্কুলেই প্রতিদিন সকালে স্কুলের মধ্যে মুক্ত অঙ্গনে সকল ছাত্র/ছাত্রী এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের একত্র হতে হতো প্রার্থনার জন্য।

আমাদের বাসস্থানের সম্মুখে মাঠে এক মনিমেলা প্রচলিত ছিল, প্রতি সপ্তাহে দু'দিন। আমরা দু'ভাই সেখানে যোগ দিয়েছিলাম। কম্পাউন্ডের আর একটি বাড়ির বাসিন্দা ছিল এক চ্যটার্জি পরিবার। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এই মনিমেলার উদ্ভোক্তা। অনেক নিয়ম আর ধৈর্যসহকারে, তিনি খুব ভাল করে চালাতেন। সুস্থ, সুন্দর জীবনযাত্রার, এবং মানবিকতার অনেক কিছু শিখেছিলাম ঐ মনিমেলায় যোগ দিয়ে। আর পেয়েছিলাম শীঘ্র সম্ভাবনাময় আমাদের দেশ স্বাধীনতার প্রেরণা ও উদ্দীপনা। মনিমেলায়, স্কুলে, সামাজিক অনুষ্ঠানে সর্বত্র সাড়া জেগেছিল পরাধীনতার কলঙ্ক মুছে ফেলার প্রেরণার আর স্বাধীন ভারতের কল্পনার।

দেশাত্মবোধমূলক অনেক গানের অনুশীলন হতো সর্বত্র। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা -- যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর হও উন্নত শির - ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা --



এবং আরও অনেক গান ছিল সকলের কণ্ঠে। আর শিখেছিলাম,

বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্
বন্ধন ভয় মুক্ত করে উচ্ছে তুলেছি মাথা
মোরাই জেনেছি কেহ নই, মোরাই মোদের পরিত্রাতা
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্
করিব অথবা মরিব এ পণ, গড়িয়া তুলিব ভারত ভূবন
স্বপ্নের মাঝে দেখিতেছি যেন স্বাধীন ভারতমাতা
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্

শোননাকি আজ শৃংখল ঐ ভাঙ্গিতেছে খান্খান্
মুক্তির কেতন উড়িছে আকাশে তারই এ বন্দনা গান
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্
করিব অথবা মরিব এ পণ, গড়িয়া তুলিব ভারত ভূবন
লক্ষ প্রাণে গাহিতে চাহেগো স্বাধীন ভারত জয়গাথা
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্

দীর্ঘ প্রতিষ্কার পরে, মুক্তির মন্দির সোপানতলে অনেক
প্রাণের বলিদানের পরে এসেছিল সেই স্মরণীয় দিন,
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ‘স্বাধীন ভারত’ এই
সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছিল সর্বত্র। আনন্দে মুখরিত
হয়েছিল দেশ। উল্লাসে ভরপুর হয়েছিল সকল গ্রামগন্ড,
শহর/নগরের শিক্ষাকেন্দ্র, কারখানা ও কর্মস্থান। স্বাধীন
ভারতের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল স্থানে স্থানে, শহরে
ও গ্রামে। বাসস্থানের সম্মুখে মাঠে উড়েছিল আমাদের
মনিমেলার উত্তোলিত পতাকা। কম্পাউন্ডের প্রায়
সকলেই এসে যোগ দিয়েছিল সেখানে।

নব ভারতের বিজয়পতাকা তোমারে নমস্কার, তোমারে নমস্কার
অশোকচক্র মুছে দিক আজ সকল অন্ধকার, তোমারে নমস্কার
দুশো বছরের শোনিত যজ্ঞ তোমাতে পেল যে স্বরাজ স্বর্গ
সুধার পাত্র এনেছে জিনিয়া শৃংখল কারাগার, তোমারে নমস্কার
এস গৈরিক স্বাধীন সবুজ এসহে শুভ্রজ্যোতি
এস প্রচন্ড জীবনবণ্যা ডুবে যাক জ্বরা ক্ষতি
মহাভারতের তীর্থসলিলে স্বাধীন সূর্য তুমি যে রচিলে
নাচে তরঙ্গে চিরযৌবন বাজে ভেরি ঝঙ্কার, তোমারে নমস্কার

আর গেয়েছিলাম স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতঃ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আরম্ভ হয়েছিল ভারতীয়ের
হাতে স্বাধীন ভারতের শাসন। কিন্তু শিরোমনি হয়ে
তখনও ছিলেন রাজা ষষ্ঠ জর্জ। রাজার প্রতিনিধি
হিসেবে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদে
নিযুক্ত হয়েছিলেন পরাধীন ভারতের শেষ বড়লাট
(viceroy) লর্ড আর্ল মাউন্টব্যাটেন (Lord Earl
Mountbatten)। দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্বশাসনের
জন্য ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের
২৬শে নভেম্বর। তিন মাস পর আরও একবার এসেছিল
সেই স্মরণীয় দিন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি
ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র শাসন আরম্ভ হয়েছিল। রাজার
পরিবর্তে দেশের শিরোমনিপদে ভারতীয়দের দ্বারা
নিযুক্ত হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি,
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।



আমার জীবনের প্রথম ১০টি বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন
স্থানে নানা রকমের আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।
জন্মের মাত্র কয়েক মাস পরেই আরম্ভ হয়েছিল
দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। লোভ, ক্রোধ, শক্তি ও হিংসায়
উন্মত্ত মানুষের সৃষ্টি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে
কলঙ্কিত এই মহাযুদ্ধ। হয়েছিল এই পৃথিবীর
ইতিহাসে আনবিক বোমার প্রথম বিস্ফোড়ন দুটি
শহরে অনেক মানুষের উপর। হারিয়েছিল
পৃথিবীময় কয়েক কোটি মানুষের প্রাণ। হয়েছিল
কুখ্যাতনামা পঞ্চাশের মন্ডল ১৯৪৩ সালে পূর্ব ও
পশ্চিম বাংলায়। অনেক পরিবারের মত আমাদের
পরিবারকেও সেই দুর্ভিক্ষ আগুনের লেলিহান শিখা
কিছুটা স্পর্ষ করেছিল।

জন গন মন অখণ্ডায়ক জয়াতু ভারত গণ্যবধাতু --

আবার অনেক দেশ পরাধীনতার গ্লানি মুছে স্বাধীনতা অর্জনও করেছিল। ১৯৪৫ সালে কোরিয়া, ১৯৪৮ সালে বর্মা (আজকের মিয়ান্মার), সিলোন (আজকের শ্রীলঙ্কা), এবং আরও কিছু দেশ। হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ইজ্রায়েলের সৃষ্টি, বাংলায় যাহার নাম ইহুদিদের দেশ, হিন্দিতে ইসাহিয়োঁ কা মুল্লুক। এসব আলোচিত হতো বাড়িতে ও বাড়ির বাইরে বয়স্কদের মুখে। এসবের গুরুত্ব তখন উপলব্ধি করিনি কিন্তু স্মৃতির কোঠায় আজও বিরাজিত। হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা।

আর হয়েছিল পরাধীনতার শৃংখল থেকে ভারতের মুক্তি। তবে এই মুক্তি সেদিন বিনা শর্তে আসেনি। মাসুল দিতে হয়েছিল সেদিন এক চরম বলিদানে, ভারতমাতার দুটি অঙ্গকে ছেদন করে। রাজনৈতিক স্বার্থ মেটাতে আর হিংসাকে চরিতার্থ করতে। দেশকে সেদিন ১৯৪৭ সালে দু'ভাগ করেছিল নির্লজ্জ্য 'সভ্য শিকারির দল'। আদর করে নামকরণ করেছিল 'পাকিস্তান (তর্জমা: পুন্যাত্মাদের দেশ)', আর 'হিন্দুস্তান (তর্জমা: হিন্দুদের দেশ)'।

স্বাধীনতা অর্জনের যে উন্মাদনা এসেছিল বেশিরভাগ ভারতবাসির মধ্যে, তার থেকে আবার বঞ্চিত ছিল দেশবিভাগের জন্য বিতাড়িত, লাঞ্চিত এবং সর্বহারা অনেক পরিবার। বেদনা ও কান্নাভরা করুন কাহিনী ছিল কত মানুষের। হাহাকার পড়েছিল পূর্ব বাংলা থেকে সদ্য আগত উদ্ভাস্তদের মধ্যে। অনেক দূরে মীরাটে থাকায় আমাদের বিতাড়িত হয়ে আসতে হয়নি, কিন্তু পূর্ব বাংলায় নিজেদের যা ছিল সেসব হারিয়েছিলাম। কোলকাতায় সদ্য আগত শরণার্থীদের দুর্গতি সেদিন নিজের চোখে দেখিনি এবং উপলব্ধি করিনি। ১৯৫১ সালে মীরাটকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানিয়ে যখন কোলকাতায় এসে নতুন জীবন শুরু করেছিলাম তখন স্কুলে, প্রাণভয়ে সপরিবারে রিক্তহাতে পালিয়ে আসা আত্মীয়স্বজনদের কাছে, এবং পাড়ায় অনেকের কাছে তাদের কান্নাভরা আর ভয়াবহ কাহিনী শুনেছিলাম। শুনেছিলাম তাদের প্রিয়জনের লাঞ্ছনা আর হারানোর কাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত উদ্ভাস্তদের



সহ্য করতে হয়েছিল প্রায় একই রকম দুর্দশা। মীরাটে থাকায় নিজের কানে শুনেছিলাম, এবং নিজের চোখে দেখেছিলাম। দুর্গাবাড়ি স্কুলে প্রায়ই নিত্যনতুন ছাত্র/ছাত্রী যোগদান করতো। তাদের মধ্যে কিছুর চোখে ছিল ভীতি, আবার কিছুর অকারনে শিহরন। শুনেছিলাম পালিয়ে আসার সময় মাঝপথে রেলগাড়ি থামিয়ে তাদের উপরে অত্যাচারের বর্ননা, কখনও বা নৃশংসভাবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই মূল্য দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রানভয়ে পালিয়ে আসা এই রকম অনেক উদ্ভাস্ত। আমি আজও তাহার সাক্ষী। একটি ঘটনার কথা আজও ভুলিনি, কথোপকথনগুলো আজও কানে বাজে। ঘটনার গভীরতা উপলব্ধি করার বয়স তখনও আমার হয়নি, কিন্তু মনে যে দাগ সেদিন কেটেছিল আজও তা মোছিনি। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তখন এক বছরও কাটেনি। স্কুল ছিল গ্রীষ্মকালের জন্য বন্ধ। মীরাটে স্কুলের মেয়াদ ছিল প্রতিবৎসর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরবর্তি জুন মাস পর্যন্ত। বাসস্থানের সামনে ছিল ঢাকা ছাতে একটি খোলা বারান্দা। বাইরে প্রখর রৌদ্রতাপ, কখনও বা 'লু' গরম বাতাস বইতো। দুপুরে ভোজনের শেষে আমি আর দাদা বারান্দায় অলস সময় কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক ফিরিওয়ালার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে এলো, "লে ককিড় লে, লে ককিড় লে, লে-". কণ্ঠস্বর ক্রমশ কাছে আসতে আসতে আমাদের বারান্দার কাছে এসে থামলো। একজন বয়স্ক মানুষ, তার কালো সাদা মেশানো গৌফদাড়ি, মাথার উপরে পণ্যের ঝাঁকা।

আমরা কিছু প্রশ্ন করার আগেই ঝাঁকাটি বারান্দায় নামিয়ে বল্লো “বেটা, বহুৎ থেকে হয়ে হুঁ, খোরা বৈহুঁ?” উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বসে পড়লো। মাথা থেকে পাগড়ি নামাতেই বুঝেছিলাম একজন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ, এক সর্দারজী। জিঞ্জাসা করলো “ঘর মে তেরা কৌন হ্যায় রে?” দরজায় দাঁড়ানো আমার মায়ের সন্ত্রস্তকণ্ঠে আদেশ এলো আমাদের দু’ভাইকে ঘরের ভিতরে আসার জন্য। অনেককাল পরে বুঝেছিলাম মায়ের সেদিন সতর্কতার কারণ। প্রতিদিন কত নতুন মানুষের, অজানা অচেনা উদ্ভাস্তর আনাগোনা ঐ অঞ্চলে। বাবা সেনাবাহিনীতে থাকলেও সেই সময়ে তো বাড়িতে নেই। আমরা কিছু বলা অথবা করার আগেই শান্তকণ্ঠে সর্দারজী বল্লো “বেটি, ডর মৎ ম্যায় ডাকু নহী হুঁ। খোড়া থেকে হয়ে হুঁ, তেরি বেটা নে বৈঠনে দিয়া।” মাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে আবার বল্লো “বেটি, ম্যায় বহুত তেয়াসি হুঁ। খোড়াসা পীনেকি পানি দে।

দুপুরের রৌদ্রে ক্লান্ত একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ জল চেয়েছে। শুধু জল দিলে যে গৃহস্থের অকল্যান হবে এই সংস্কারে মায়ের বিশ্বাস ছিল। রান্নাঘরে তখন ছিল শুধুমাত্র সকালের সেকা উদ্বৃত্ত দুটো শুকনো রুটি। তারই সাথে একটু জাগরি (গুড়) আর পানীয় জল এনে দিতেই ছলছলে দুটি চোখ সর্দারজির। ধরা গলায় বল্লো “গুরুজি তেরি ভলা করে। বেটি তু এক কাম কর। তু মেরেসে দো ককিড় লে লে।” ককিড় দেবার প্রয়োজন নেই সেটা বলায় সে তখন গম্ভীরকণ্ঠে বল্লো “বেটি ম্যায় ভিখ নহী মাস্ততা হুঁ। তু মেরা ককিড় ন লে তো ম্যায় তেরি পানি নহী পিয়ুঙ্গা।” অগত্যা মাকে রাজি হতে হোলো।

অল্প কিছুক্ষনই বসেছিল সে। জলের সাথে রুটি খেতে খেতে তার ফেলে আসা জীবনের কিছু বিবরণ দিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পাঞ্জাবের এক গ্রামে ছিল তার বাসস্থান। বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষের বসতবাড়ি এবং চাষের জমিজমা ছিল তার। শয্যশ্যামল ছিল তার গ্রাম। ছিল নিজের পরিবার, ভরা সংসার, একাধিক পুত্র, পুত্রবধু পৌত্র/পৌত্রি। শুধু ছিলনা পুঁথিগত বিদ্যা (“লিখাই পড়াই”)। দেশ ভাগ হয়ে গেল। ভাগ হবার কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল দাঙ্গা হাঙ্গামা। প্রশাসনের সাহায্য একটু আধটু তাও পেতো।

ভাগ ঘোষনার পর শুরু হয়েছিল আক্রমণ এবং লুটপাঠ। প্রতিরোধের অনেক চেষ্টাও তারা করেছিল। এবারে নতুন প্রশাসন রয়েছিল মুখ ঘুরিয়ে। যৎসামান্য কিছু সম্বল সাথে নিয়ে, বাকি সর্বস্ব পিছনে ফেলে রেখে সপরিবারে পালিয়ে এসেছিল হিন্দুস্তানে। স্বাধীন দেশে তারা তখন নিঃসহায়।

পরিবারে যে যতটুকু পারে তাই দিয়ে চেষ্টা করেছিল নতুন স্থানে যথাশীঘ্র আবার আত্মনির্ভরশীল হতে। সে নিজেও এই পরিনত বয়সে ককিড় ফিরি শুরু করেছিল। ধরা গলায় আর ছলছল চোখে সেই প্রৌঢ় সর্দারজির বাকি বর্ণনা ঐ অল্প বয়সেও আমার মর্মকে স্পর্শ করেছিল। কথার বিনিময়ে জেনেছিল আমাদের উৎস পূর্ববাংলার। যদিও উদ্ভাস্ত হয়ে আসিনি তবু হারিয়েছি আমরাও সব। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমার মা অপলক দৃষ্টিতে হতবাক হয়ে সব শুনছিলেন এতক্ষন। সর্দারজি মা’র উদ্দেশ্যে বল্লো “বেটি, এইসা আজাদিসে তেরে ঔর মেরে পরিবারৌকো কেয়া মিলা রে? হম্মে তো সব খোয়া।” এই প্রশ্নের উত্তর মায়ের কাছে ছিলনা। মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যায় বাবাকে জিঞ্জেস করেছিলাম আমাদের দেশটাকে কেন দু’ভাগ করা হোলো। একটু মৌনতার পরে বাবার উত্তর ছিল “ও তুই বুঝবিনা।” সত্যিই তো সেদিন আমার মাত্র ৯ বৎসর বয়সে কিভাবেই বা বুঝতাম যা’র সঠিক উত্তর আজও পাইনি।



প্রৌঢ় সর্দারজির সেদিনের কথাগুলোর মধ্যে যে কত গভীরতা ছিল আমি সেদিন উপলব্ধি করিনি। কিন্তু নিজের অজান্তে কোনও এক অদৃশ্য শক্তি সেদিন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিছু বার্তা বহন করে এনেছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে, মাথায় পাগড়ির উপর ঝাঁকাটা তুলে
সর্দারজি মাকে বল্লো “বেটি তেরি পরিবারকো ভলা হো”।
“লে ককিড় লে, লে ককিড় লে, লে--”। দৃষ্টিসীমার বাইরে
চলে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়েছিলাম। তাকে আর কখনো
দেখিনি। এদিনের পরেও তো তিন বছর মীরাটে ছিলাম।
সে আর আসেনি। হয়তো বা সেদিন কোনো নির্দেশ দিতে
এসেছিল, হয়তো বা অন্তরের বেদনার সমব্যর্থি কাউকে
প্রয়োজন ছিল তার, ককিড় ফিরিটা একটা অজুহাত
মাত্র। সেটা সে পেয়েছিল। সেদিন তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ
দূরে যেতে যেতে নিদাঘের তপ্ত হাল্কা বাতাসে মিলিয়ে
গিয়েছিল। কিন্তু তার সেদিনের প্রশ্নের উত্তর আজও
পাইনি, আর তার রেখে যাওয়া বার্তাগুলো আজও
ভুলিনি।



অভিমান

-মঞ্জু প্রামাণিক



তুমি চলে গেলে
মোরে তুমি বলে গেলে না--
ভেবে ছিলাম হাত ধরে নিয়ে যাবে
তাও নিলে না--
দোর খুলে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
আসবে ফিরে আবার তুমি
তোমার আর আসা হলো না--
পথ হারিয়ে গেলাম আমি
তোমায় খুঁজে পেলাম না--
ডাক দিয়ে যাও বারে বারে
শুনতে আমি পাই
কিন্তু আমি
যাচ্ছি বলে পথ খুঁজে না পাই--
পথ হারা এক পথিক আমি
পথ খুঁজে না পাই--
দূরের থেকে দেখো তুমি
হাত বাড়িয়ে দাও যদিবা
তোমার হাতটা ধরে যাই--



STERLING PRINTER IS HAPPY TO BE THE
OFFICIAL PRINTER FOR THIS MAGAZINE.

SDO Certified MBE • Union Shop • Family-Owned

Advertising Specialties • Apparel • Banners • Bindery • Blueprints
Business Forms • Commercial Printing • Direct Mail
Full Color Printing • Graphic Design • High Speed Copies
Large Format • Menus • Political Printing • Posters
Rubber Stamps • Scanning • T-Shirts • Yard Signs

MASSACHUSETTS STATE CONTRACTS

CLT 09

- Uniforms
- Athletic Wear
- Outerwear
- Environmental Clothing
- Linens and Bedding
- Personal Care Products
- Miscellaneous Items

OFF 48

- Printing
- Copying
- Mailing Services
- Promotional Products



A Night That Led To An Incredible Dawn

Soumi Mukhopadhyay

Invoking The Goddess

Autumn puts on her best attire to greet the Goddess, The epitome of beauty, power, courage, and kindness. She defeats the demon and restores peace, and makes the never-ending turmoil cease.



Aswiner sarada prate beje utheche
alokomonjir.....

The clock strikes 4 am.

The air fills with a joyful note as the Goddess is invoked.

In the wee hours of Mahalaya. Yes, the day our own Maa Durga comes to Earth.

We await her arrival with bated breath every year. Finally, when she arrives, we all indulge in the grand celebration of the festival.

Mekhla's Story

Mekhla wakes up from her sleep. To listen to 'Mahisashur Mardini', just like any other Bengali household. This has been a yearly ritual for her.

Mekhla is an eighteen-year-old girl. Her story is different from ours. She is an ordinary girl with extraordinary powers. She lost her mother at a very young age. Since then, she has been caring for her ailing father at home.

Not only does she have to attend to her father, but she also has to fulfil her responsibilities as an elder sister to her younger sister. Also, she has a dream that her life too would change.

Mekhla never had the opportunity to enjoy life.

Mekhla taught students during the day to earn some money. To make ends meet. She was pursuing Economics (Honours) and studying at a night college.

We might be enjoying Durga Puja and decking up in the best attire.

But not for Mekhla.

Her struggle for survival is constant. It feels like there is no end in sight.

The little girl had to undergo bitter experiences at a very tender age.

The only thing that she finds solace in is music.

Music has magical elements that transport her to a new world. A world of her own.

Durga Puja began, and the streets bustled with the crowd. There was a different vibrance in the atmosphere. Puja for Mekhla meant visiting a few pandals nearby with her little sister. That too, when all the household chores are done. The Ninth Day Of Puja
Eight days of puja passed by in the blink of an eye.

Today is Navami. The last day of Maa Durga on Earth. From tomorrow, everything will return to normal. The same old routine every day for another year. Mekhla felt sadness in a corner of her heart. She did not understand the reason. Maa Durga was right before her with her four children.

“Why can’t Maa Durga stay forever with us?” she wondered in her mind. A drop of tear rolled down her cheeks as she searched for her mother in Goddess Durga.



Mekhla joined her hands one last time before leaving the pandal. It was 9:30 pm.

A Strange Lady

Mekhla was overwhelmed with loads of emotions and prayed to God in a desperate attempt to put an end to all of this. Suddenly, a lady stormed inside. “Is there anything I can help you with?” asked Mekhla politely.

The lady looked tense. “Help!..... Help!” screamed the lady. “I can’t find my four-year-old sonHe was playing here.....Suddenly I couldn't see him!..... Can you help me out?”

The lady was dressed beautifully in a red saree and gold jewellery. There was an air of composure surrounding her amidst chaos. Both Mekhla and the lady set out in search of the kid. But he was not found anywhere.

“Do you have your son’s picture?” asked Mekhla. The woman showed her some of the pictures of her son on her phone.

They left no stone unturned in searching for the kid. But all the efforts turned in vain. Mekhla asked the lady to lodge a missing complaint with the local police station, but the lady refused.

She started narrating a story. The story of a mother. The pain a mother goes through to give birth to a child.

All mothers are special. And so are their children. Mothers are created to nurture existence, to sustain life.

Life is incomplete for a child without a mother. And a mother’s life has no meaning without her child. “Can you promise me one thing today?” asked the lady.

Mekhla was dumbfounded. “You will never carry the burden of sadness in your heart...Your mother will never be at peace seeing you like thisFind joy in the little pleasures of lifeYour father, your siblings are also no less than your motherAdmire what you have.Do not run after something that could have been.....,” the lady continued.

“Mumma.....Mumma.....Where have you been?” Suddenly, a little boy came running towards them. The lady could not hold back her tears of joy on seeing her child.

He had lost his way amidst the crowd. Seeing the union of the mother and the child made Mekhla realise the value of life. How fortunate she is to have a family! There are so many who are abandoned at birth.

Those who struggle to get the basic amenities of life. She felt herself to be blessed. This lady taught her how precious life was. It is not so trivial to waste time thinking about what we do not have. Appreciate what you have.



Mekhla was about to thank this super lady who changed her life forever. But before she could say anything, the lady gave her an envelope.

“Thank you for what you have done to unite a mother and son today....Remain a good human being.....May God bless you with all the happiness in life.....Will meet soon....,” the lady said.

Then this lady started moving ahead, carrying her son in her arms. The boy had an innocent smile on his face as he waved.

Disappearance

Mekhla ran after them. “Please tell me your name before leaving. What is your name?..... Who are you?” she continued. But the lady disappeared in thin air all of a sudden. This astonished Mekhla. The feeling was uncanny.

When she discovered this, she found herself in the middle of a deserted street. How can the streets be so empty during Durga Puja? “Where am I?” Mekhla wondered. She started running and somehow managed to reach her home. Her home looked different.

They were not able to renovate their home due to a lack of finances. How come all of a sudden it transformed into a massive bungalow?

She could not believe her eyes, but her trust was restored seeing her father at the gate.

Her father is in the pink of his health. It seemed that nothing had happened to him.

Mekhla pinched herself to make her believe this was a dream. But it was not. Mekhla's dreams were coming true. "Where have you been....It is 3 am....We were worried about you....Are you fine, my child?" asked Mekhla's father.

"Yes, I am fine, Papa.....But how come all this happened?"

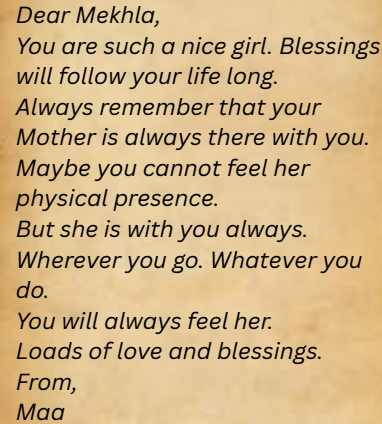
Her father laughed and told her about the mysterious lady who had come to their home on Navami night. "She came here in search of her son.

The lady left when she could not find her son. Everything just changed like magic when she left. The walls, the home, the decor, my health... I was lying on my bed, but suddenly I could feel strength in my hands and legs....All of a sudden, it felt that I was never ill at all..."

A Letter

The next thing that happened was straight out of a storybook. This kind of thing only happens in fiction. Not in reality. Mekhla opened the envelope to find a bank cheque inside. The cheque promised a huge sum to her. How is that even possible?

Who is this lady? From where did she manage to find so much wealth? And why was she contributing so much money to her? They had no blood relation and were not friends. The lady was a stranger. There was also a letter along with the cheque. The letter read:



*Dear Mekhla,
You are such a nice girl. Blessings
will follow your life long.
Always remember that your
Mother is always there with you.
Maybe you cannot feel her
physical presence.
But she is with you always.
Wherever you go. Whatever you
do.
You will always feel her.
Loads of love and blessings.
From,
Maa*

A Fictional Reality

Mekhla was trembling in utter astonishment. Her mother had died ten years ago. How come she gets the letter from her mother, who is no longer alive?

Why would anyone be so kind as to offer such a huge sum?

Mekhla was not able to sleep that night. It was the dawn of Bijaya Dashami. A day to bid farewell to the mother.

A melancholic mood lingered everywhere. But the end of the day marked the closure of the grand festivity of nine days. Everyone returned to their normal lives. Days turned into weeks and eventually into years. Mekhla's life changed forever. She and her sister studied and established themselves in life. Mekhla's father was fit and fine. With no health issues. All of them stayed happily ever after.

But the memory of the Navami night remains fresh in Mekhla's memory. She is still clueless about that magical night. Her life feels like a dream from that day onwards. A dream that she never wants to get shattered. The life she wanted. She always felt the presence of a superpower by her side from that day onwards. Every year, she searches for that mysterious lady during Durga Puja, but that unknown lady remains unknown to date.

Will she ever find that mysterious lady? Well, Mekhla does not have the answer, but she learnt how to stand up strong in life's battles and emerge victorious. For life is too short to be spent in regretting the things that you don't have.

***Always remember that there is an unseen force with you,
A mother who paves your path and guides you through.***



Pujo Puzzle

-WITHLOPA



	কু	
--	----	--

	লা	
--	----	--



আজ দশমী

গৌরব মুখার্জী

আজ কৈলাশপুর থানার বড়বাবু দেবরাজ ভৌমিকের মন একধারে কিছুটা ফুরফুরে, আরেকধারে দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত। ফুরফুরে হওয়ার কারণ আজ দশমী। অতএব আজ রাত পেরোলেই পুজোর ডিউটি শেষ, আর গত কয়েকদিন ধরে চলে আসা কাজের চাপ থেকে মুক্তি। কিন্তু সেই মুক্তির পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে তার দুশ্চিন্তার কারণ।

কৈলাশপুর থানার অন্তর্গত দশটা গ্রামের অন্যতম হলো চণ্ডীতলা। সেখানকার এককালের জমিদার চৌধুরীদের প্রাচীন দুর্গা পুজো এখনো চলে আসছে। সেটাই এইদিকের সবচেয়ে বড় পুজো। এখন সেটার দায়িত্বে চৌধুরীদের বর্তমান প্রজন্ম - পঞ্চায়েত প্রধান মহীতোষ চৌধুরী আর তার দুই ছেলে - চন্দন আর মুকুন্দ। সে যুগে জমিদারদের প্রতিপত্তি আজ এসে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়েছে কেবলমাত্র, কম কিছুমাত্রায় হয়নি। আজকাল রাজনীতির রং ধর্মের রঙে রাঙিয়ে গেছে অনেক সময় আগেই। তাই রাজনীতি আর ধর্মের হাতে হাত ধরেই এই চৌধুরীরাও এগিয়ে চলছে ক্ষমতার পথে। আর এদের কারণেই ভৌমিকবাবুর যত ঝামেলা। তিনি নিজের ঘরে চেয়ারে বসে এসবই ভাবছিলেন। তার ভাবনার ঘোর ভাঙলো থানার ছোটবাবু অর্থাৎ তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর তমাল সাঁপুইয়ের কথায় - "স্যার, কি এতো ভাবছেন? পুজো তো আজই শেষ। বাড়ি ফেরার সময় মিষ্টি কিনে ফিরবেন তো?"

"তা তো কিনবো বটেই, তবে পুজো তো এখনো শেষ হইয়াও হইলোনা শেষ ভাই।"

"কেন স্যার? এইতো দুপুর হতে চললো। একটু পরেই তো সব বিসর্জনের জন্যে বেরিয়ে পড়বে। আর ওটা হলেই তো সব মিটে গেলো।"

"তুমি এখানে নতুন এসেছো ভায়া তাই সব জানোনা। এই বিসর্জনটা নিয়েই আমার চিন্তা। প্রত্যেকবার হয়না, তবে এবারে চিন্তার বিষয় আছে।"

"মানে স্যার কিছুই ঠিক বুঝলাম না, যদি সব একটু খুলে বলেন।"

"এদিকে পুজো তো জানোই বেশি কিছু হয়না। ওদিকে হালদারপাড়ার পুজো, আর খালপাড়ের দিকে গত কয়েক বছর ধরে গজিয়ে ওঠা ছেলেছোকরাদের একটা নতুন পুজো। আর এখানকার সবচেয়ে বড়ো পুজো হলো চৌধুরীদের বাড়ির পুজো, সে তো জানোই। আশা করি এবারে দেখেও এসেছো।"



তমাল মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাতে, বড়বাবু বলে চললেন - "সমস্যা হলো ওই চৌধুরীদের বাড়ির বিসর্জন নিয়ে। প্রত্যেক বার হয়না, তবে এইবারে আছে। ওদের বিসর্জন হয় ওই আটঘাটের দীঘিটাতে। ওদেরই কোনো পূর্বপুরুষ নাকি ওইটা তৈরী করিয়েছিলো। প্রকান্ত দীঘি, তার বাঁধানো আট খানা ঘাট, তাই থেকেই ওই নাম। লোকমুখে শোনা যায় যে তাতে নাকি ওই চৌধুরীদের কোনো এক বংশধর পরে মানস সরোবর থেকে এনে এক ঘটি জল মিশিয়েছিলো - আর তখন থেকেই ওদের এই রীতি যে ওই দীঘিতে বিসর্জন হলে নাকি মা একেবারে সোজা গিয়ে ওঠেন বাবা ভোলানাথের গৃহের দোরগোড়ায়, আর তারপর টপ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন। একদম এখনকার বন্দেভারত মার্কা ব্যাপার স্যাপার আরকি। তবে ওই দীঘিতে যেতে হলে মুনিস ফকিরের মাজারের পাশ দিয়ে যেতে হয়। অন্য রাস্তায় আছে যদিও, তবে তাতে একটু ঘুরপথ হয়। অন্যান্য বার কোনো সমস্যা না হলেও, এইবারে আজ দশমীর দিনে ফকির সাহেবের মাজারে চাদর চড়ানোর দিনও পড়েছে। মানে আজ ওনার জন্মতিথি না কি সব যেন তাই। ঐখানে আজ তাই একটু ভিড় হবে, কিছু বিক্রিবারটা ঠেলাও বসবে রাস্তার দুই ধারে। বেশ কয়েক বছর আগেও এই একই দিনে দশমী আর ফকির বাবার চাদর চড়ানোর দিন পড়েছিল। আর সেইবার লেগেছিলো ধুকুমার - চৌধুরীদের বিসর্জনের দল ওদিক দিয়েই যাবে আর মাজারের সামনে লোকের ভিড়ে রাস্তা আটকানো। অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে বললে চৌধুরীরাও বেঁকে বসলো যে তারা এই রাস্তা দিয়েই যাবে। সেই থেকে দুই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হাতাহাতি লেগে যায়। সেইবার অনেকে আহত হয়েছিল। যদিও সেই সব ঝামেলা শেষমেশ মিটে গিয়ে বিসর্জন ঠিকঠাক হয়ে গেছিলো। কিন্তু তারপর ওপরমহলকে জবাবদিহি করতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো। আমার আশঙ্কা সেরকম কিছু এইবারে আবার হতে পারে।"

তমাল এইবার সব বুঝতে পেরেছি মার্কা মাথা নাড়িয়ে বললো - "এইবারে বুঝলাম স্যার আপনি কেন গুম মেরে রয়েছেন। কিন্তু আপনি বললে আমি ওখানে কয়েকজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ কিছু হলে ওরা সামলে নেবে।"

"আরে সে তো আমি সকালেই দুজনকে মাজারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি সব সামলে রাখতে। আর এই দুপুরবেলা আরও দুজনকে পাঠিয়েছি ওই চৌধুরীদের বিসর্জন যাত্রা সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্যে। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, যদি ঝামেলা কপালে লেখা থাকা তা এড়ানো মুশকিল।"

"স্যার আপনি কি কিছু সন্দেহ করছেন?" বড়বাবুর গলায় একটা অস্বস্তির সুর তমালের কান এড়ায়নি।

"তুমি ঠিকই ধরেছো তমাল। সেবারে ব্যাপারটা কোনোমতো মিটে গেলেও, তারপর থেকে এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর চৌধুরীবাবুর ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্মের রং আরও ভালো করে রাজনীতিতে মিশেছে। তাই আমার এইবারে গন্ডগোলের আশঙ্কা আগের বারের থেকে একটু বেশি হচ্ছে।" বলেই বড়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে, তমালও উঠে দাঁড়ালো।



ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বড়বাবু বললেন, "চলো তমাল, বিসর্জনের দল চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরোতে একটু সময় আছে। আমরা বরং এই ফাঁকে মাজার থেকে একটা টুঁ মেরে, ওখান থেকে সোজা চৌধুরীদের ওখানে চলে যাবো।" মাজারে পৌঁছে তমালের চোখে পড়লো যে আজ এদিকে সত্যি বেশ ভালো ভিড়। আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোকই এসেছে, আর সাথে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকান বসেছে - ওই ফুলের চাদর, ধূপকাঠি বিক্রি করতে। সাথে আবার জিলিপি সিঙ্গারা, ফুচকা চুরমুরের কিছু ঠেলাও আছে।

ইতিমধ্যে বড়বাবু মাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বয়স্ক লোকের সাথে কথা বলছেন দেখে তমাল সেদিকে এগিয়ে গেলো। তমালকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে উনি বললেন, "তমাল ইনি হলেন ইমাম মুস্তাফি সাহেব। এই মাজারের দেখা শোনা উনিই করেন।" ইমাম সাহেব তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সেলাম জানিয়ে বললেন, "আমি দেখে রাখার কে জনাব, সব ওপরওয়ালার জাগির, উনিই সব দেখে রাখেন, আর নাম হয় আমাদের।" ইমাম সাহেবের কথা শুনে তমালের একটা শ্যামা সংগীতের কথা মনে পরে গেলো - "সকলি তোমারি ইচ্ছা।" সে যেন এখন সেই একই কথা গুলোই একপ্রকারে ওনার মুখ থেকে শুনলো। ইমাম সাহেব এবারে একদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমার বয়স হয়েছে, একা কি আর এখন সব পারি। ওই সেলিম আছে, ওই এখন হাতেহাতে অনেক কাজ করে দেয়, তাই সব এখনো চলছে।" ওনার ইঙ্গিত পাশের গাছতলায় বসে থাকা এক বারো - তেরো বছরের ছেলে দিকে। সে এখন মাটির দিকে মুখ করে বসে আছে। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে মুখে তার ম্লান ভাব।

বড়বাবু এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে তোর আবার কি হলো? মুখ ভার কেন?" বড়বাবুকে দেখে সে যেন কিছুটা ভরসা পেয়েছে সেরকম ভাব করে বললো, "কি বলবো স্যার, খুব ঝামেলায় পড়েছি। ওই চৌধুরী বাড়িতে বিসর্জনের আগে নীলকণ্ঠ পাখি পৌঁছে দেওয়ার বরাত পেয়েছিলাম, কিন্তু সে এখনো পৌঁছনো হয়নি। আপনি তো জানেনই স্যার, ওই মুকুন্দবাবু কি রকম রগচটা - দেরি দেখলে লোক পাঠিয়ে ব্যাপক কেলাবে। আপনি বাঁচান স্যার।" তমাল এবারে তাকে প্রশ্ন করলো, "কেন, পাখি পাসনি নাকি? আর পাখি ধরবি কি রে, সে তো আইন বিরুদ্ধ কাজ - পুলিশের সামনে এসব বলছিস?" এই শুনে সেলিমকে আরও ঘাবড়ে যেতে দেখে বড়বাবু বললেন, "আরে এতো পুজোর নিয়ম হে তমাল। পাখি উড়ে কৈলাশে গিয়ে উমাপতিকে উমার ফিরে আসার খবর জানাবে, তারপর উমা রওয়ানা দেবে। আর পাখিটাকে তো ছেড়েই দেওয়া হচ্ছে, তাহলে আর আইনের কি। আইনকে ধর্মের পথ আগলে দাঁড়াতে না দিলেও চলবে এই ব্যাপারে।" উনি এবারে সেলিমকে প্রশ্ন করলেন, "পাখি ধরতে পেরেছিলি না পারিসনি এখনো?" সেলিম বললো, "একটা নীলকণ্ঠ পেয়েছিলাম তো, কিন্তু ওই মেয়েটা পাখিটা বন্ধুদের দেখাবে বলে অল্প সময়ের জন্যে নিয়ে যাওয়ার বায়না করতে দিয়ে দিলাম। কিন্তু সেই মেয়ের তো এখন কোনো পাত্তা নেই।"

"কোন মেয়ে?" তমালের এই প্রশ্নে সেলিমকে নিরুত্তর দেখে ইমাম সাহেব বললেন, "এ নিশ্চই গুড়িয়া বেটি। ওই সকালে এসেছিলো চাদর চড়াতে, তারপর থেকে আমি তাকে আর দেখিনি। কিরে সেলিম, মেয়েটা কি পাঁচ ছয় সাল উমরের ছিল? হলুদ রঙের পোশাক পরা?" সেলিমের মুখ এবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আর সে মাথা নেড়ে ইমাম সাহেবের কথায় সম্মতি জানালো। বড়বাবু ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি চেনেন নাকি মেয়েটাকে? তাহলে একবার খবর পাঠান না তার বাড়িতে যে পাখিটা যেন ফেরত দিয়ে যায়।" ইমাম সাহেব দুপাশে মাথা নেড়ে বললেন, "না জনাব মেয়েটাকে আমি চিনি না। আজ সকালেই প্রথম দেখলাম। তখনি নামটাও বললো। বলেছিলো যে কাছেই থাকে। বেড়াতে এসেছে, চলে যাবে।"

তমাল ইতিমধ্যে এক পাশে সরে এসে নিজের ফোনটা কানে লাগিয়েছে। চৌধুরীবাড়িতে যে কনস্টেবলরা গেছিলো তাদের একজন ফোন করেছে। ফোনে কথা শুনে সে বড়বাবুর পাশে এসে জানালো, "স্যার, সেলিম ঠিকই বলেছে। ওদিকে হৈচৈ পরে গেছে, সেলিমকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে ওরা এদিকে - এই এলো বলে।" সব শুনে বড়বাবু বললেন, "আমি এদিকে আছি, সামলে নেবো। তুমি এখুনি সেলিমকে সাথে নিয়ে থানায় চলে যাও। আমি না আশা অন্দি একদম বেরোবে না।" তমাল তার স্যরের কথা মনে তৎক্ষণাৎ সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে থানার দিকে বেরিয়ে গেলো।



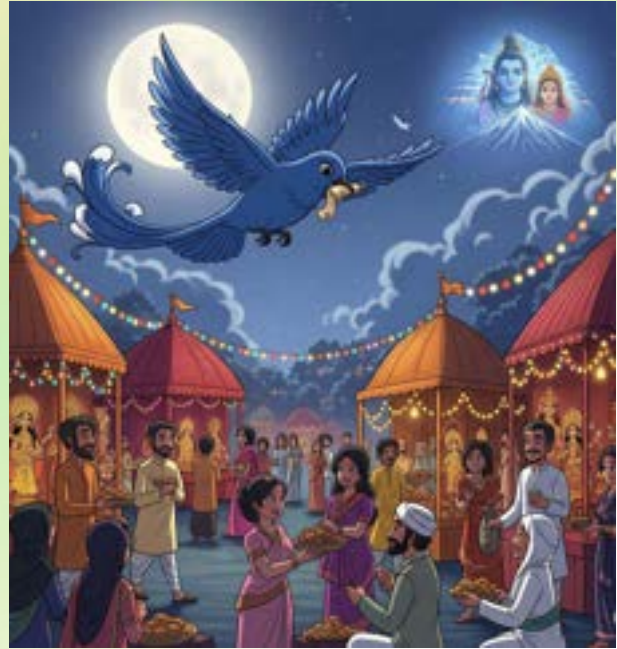
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে, এখন বিকেলও শেষ হতে চললো। কিন্তু এখনো বড়বাবুর কোনো পাত্তা নেই। তমাল তাকে বেশ কয়েকবার ফোন করলেও, ফোন বেজে গেছে, উনি ফোন তোলেননি। তার চিন্তা মুহুর্তে মুহুর্তে বেড়েই চলেছে। এবারে যা হয় হবে, আর অপেক্ষা না করে সে বেরোবে ভাবতে ভাবতেই থানার বাইরে জিপ থামার আওয়াজ এসেছে। সে বেরোতে যাওয়ার আগেই দেখলো হাসি মুখে মিষ্টির হাড়ি হাতে বড়বাবু ঢুকছেন। তমালের মুখের ভাব লক্ষ্য করে হাতের হাড়িটা একজন কনসেটবলের হাতে চালান করে চোখের ইশারায় তাকে ভেতরে নিজের ঘরে আসতে বললেন।

"বুঝলে তমাল, আজ এ এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা হলো। চৌধুরী বাড়ির থেকে আসা লোকগুলোকে সামলে ওদিকে যেতে প্রায় বিকেল হয়ে গেলো। তারপর ওখানে পৌঁছে আমরা সবাই অবাক। বিসর্জনের প্রস্তুতি সব সম্পূর্ণ। ওরা প্রায় বেরোতেই যাচ্ছিলো। পাখির কথা জিজ্ঞেস করতে একজন বললো যে সে তো অনেক আগেই দিয়ে গেছে। আর তাকে ওড়ানো হয়ে গেছে। তারপরের সব আচার অনুষ্ঠানও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পাখি কে দিয়ে গেছে খোঁজ করতে, জানা গেলো যে কোন এক হলুদ শাড়ি পরা বছর পাঁচ ছয়ের বাচ্চা মেয়ে এসে নাকি খাঁচা শুধু পাখি দিয়ে গেছে। সে এখন কোথায় কেউ জানেনা। কি নাম ধাম জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে নাম হয়তো গৌরী। তবে তাদের মনে হয়েছিল যে এ নিশ্চই বাড়ির ঠাকুরমশাইয়ের নাতনি হবে, সেই দিয়ে গেছে। তারপর আর কি, ওদের সাথেই গিয়ে বিসর্জনটাও সামলে দিয়ে এলাম, যাতে রাস্তায় আবার কোনো গোল না বাঁধে। কিন্তু কি ভাগ্য, এই পাখি নিরুদেশের চক্ররে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছিলো, তাই মাজারের পাশের ভিড়ও ততক্ষণে পাতলা হয়ে গেছে। অতএব আমিও এবারে নিশ্চিত হয়ে ফিরলাম। মিষ্টিটা অবশ্য থানার সকলের জন্যে ওই চৌধুরীরাই পাঠিয়ে দিলো। বিজয়া বলে কথা। চলে এসো এবারে কোলাকুলিটা সেরে ফেলা যাক।" বলেই উনি উঠে পরে তমালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মিষ্টি খেতে খেতে তমালের দিকে তাকিয়ে বড়বাবু বললেন, "কি হে তুমি এতো কি চিন্তা করছো আবার?" সে ওনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বরং তাকেই একটা প্রশ্ন করলো - "স্যার অ্যানাগ্রাম কাকে বলে জানেন?" উনি একটু হেসে বললেন, "বয়স হয়েছে বলে সেকলে ঠাউরেছো নাকি হে? অ্যানাগ্রাম হলো শব্দের অক্ষরের ফের বদল করে আরেকটা শব্দ তৈরী করা - সঠিক শব্দ, আবোলতাবোল কিছু নয়। ঠিক আছে?"

"স্যার, মাজারে সেলিমের থেকে পাখি নিয়ে আসা মেয়েটা গুড়িয়া - GURIA, আর দেরি করে পাখিটাকে ওই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া মেয়েটা হলো গৌরী - GAURI - আর গৌরী কার আরেক নাম জানেন তো? যার কৈলাশে ফেরার বার্তা ওই নীলকণ্ঠ পাখি বিসর্জনের আগে বয়ে নিয়ে যায়।"

হতবাক ভাবে তমালের দিকে চেয়ে থাকা বড়বাবুকে সে বললো, "আপনার দুশ্চিন্তা হয়তো আজ মা নিজেই দূর করে দিলেন। সাথে ফকির বাবার মাজারে চাদর চড়িয়ে দিয়ে আমাদের আরও বড় কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।"



**When it comes to mental health,
every conversation counts.**



*"It's easy to feel like you're the only one in the world struggling.
With Samaritans, you feel hope instead of despair."*

- Apratim Purakayastha, Samaritans Board Member

**Samaritans offers free, lifesaving services to prevent suicide and provide hope,
because everyone needs someone to talk to.**



Crisis Services



Community Education



Support Groups

Together, we can save lives



Attend Events



Make a Gift



Volunteer

Get Involved: [samaritanshope.org](https://www.samaritanshope.org)

Call or text 988 to get free,
confidential support 24/7.

Youth can text Hey Sam at
439-726 for peer support.

988

SUICIDE & CRISIS
LIFELINE





টানা পোড়েন

শৌনক মুখার্জী



রাইড শেয়ার এপে অডি দেখলো ক্যাব আসতে এখন ২২ মিনিট লাগবে !!

এই সময়টা অডি যে কি করে কাটাতে ভেবে পাচ্ছিলো না, এই রকম ভাবে রাস্তায় অপেক্ষা করার কথা ভেবেই প্রচন্ড অস্বস্তি হচ্ছিলো। সব কেমন যেন বদলে গেছে, আজকে নবমী, কলকাতা শহরটা আরো যেন বেশি করে জেগে উঠেছে, কোথাও কোনো ক্লাস্তি নেই, কোনো আক্ষেপ নেই... সত্যি কি নেই? সত্যি কি দেবী পক্ষে সব না পাওয়ার কষ্ট, বেদনা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটে? নাকি এই সব অনুভূতিগুলো চাপা পরে যায় চারিদিকের কলরবে, উৎসবের জোয়ারে ভেসে যায় ন্যায়বিচারের দাবি !!

কালকে দশমীর ভাসানে রাস্তার কি যে অবস্থা হবে সেটা ভেবেই অডি সিধান্ত নিয়েছিল তার ফ্লাইটটা একদিন আগেই প্রিপন করে নেবে। একদিক থেকে আরো একটা সুবিধে হবে তার, শনিবার বোস্টন পৌঁছলে, অন্তত রবিবারটা হাতে থাকবে জেট লাগ কাটানোর জন্যসোমবার সকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে প্রজেক্ট প্ল্যানিং, ডেলিভেরাবলেস..

আজকে সতেরো বছর কলকাতার বাইরে কাটিয়ে, এই বার পুজোর সময় হটাৎ করেই সুযোগটা এসে গেছিলো অভির কাছে। ব্যাঙ্গালুরুতে একটা অফিসিয়াল কংগ্রেসফারেন্স এটেন্ড করার জন্য অভিকে আসতে বলা হয়েছিল, সেই সুযোগে অডি আরো দুটো সপ্তাহ WFH নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলো।

প্রথম কিছু দিন সব কিছু বেশ ভালো লাগছিলো অভির, প্রায় ৬ বছর পর নিজের বাড়ি ফিরছে সে, এর মধ্যে তার মা বাবা বেশ কয়েকবার এসেছিলো তার কাছে। সেটাই অভির কাছে বেশি কনভেনিয়েন্ট

লাগতো, তার নিজের ব্যস্ত জীবনে ছুটি প্রায় নেই বললেই চলে, হ্যা খাতায় কলমে তার প্রাপ্য ছুটি অনেক থাকলেও সেটা আর নিয়ে ওঠা হয়না তার। কিন্তু কয়েকদিন পর থেকেই সব কিছুতেই কেমন যেন একটা বিরক্তি লাগতে থাকলো তার...

ছোটবেলা থেকে যেই চেনা অচেনা শব্দের মধ্যে অডি নিজেকে খুঁজে পেত, সেই শব্দগুলো তার কানে যেন অসহ্য লাগল, সারাক্ষন তার ঘরে লোকজনের আশা যাওয়াটা মনে হতে লাগলো যেন তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত আনছে; অথচ এই অডি ছোটবেলায় লোকজন কত ভালোবাসতো, একা থাকাতাই যেন তার কাছে ছিল একটা পানিশমেন্ট। এতো বছর বোস্টনে একা থাকতে থাকতে অন্য কোনো মানুষের উপস্থিতিটাই কেমন যেন অপ্রীতিকর লাগে এখন অভির, সেটা বাড়িতে শুধু নয়, রাস্তায় বেরিয়েও বা কোনো শপিং মলে গিয়েও অনুভব করেছে অডি।

হটাৎ তার চেতনাটা ফিরলো একটা অচেনা ডাকে: "দাদা !" অডি দেখলো তার ক্যাব এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সে, বারান্দায় দাঁড়ানো মা আর বাবাকে হাত নেড়ে ফোনটা খুলে নিলো, অনেক গুলো মেইল ঢুকেছে। "দাদা, OTP টা?", জিজ্ঞেস করলো ক্যাব ড্রাইভার। "ও হ্যা", অডি OTP ta শেয়ার করলো। ড্রাইভারের পাশে লাগানো ফোনের ম্যাপে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ফুটে উঠলো ডেস্টিনেশনে, সময় দেখাচ্ছে ১.১৫ ঘন্টা লাগবে, তাড়াতাড়ি একবার সেটা দেখে নিয়ে অডি নিজের কাজের মেইল গুলোতে মনোনিবেশ করলো। "দাদা, আপনাদের পাড়ার ঠাকুরটা খুব সুন্দর হয়েছে এবছর", বললো ক্যাব ড্রাইভারটা। "হুম", অডি

অমনোযোগী হয়ে উত্তর দিলো। সত্যি তো এতো বছর পরে বাড়ি ফিরেও অভি কেবল মাত্র দুবার প্যান্ডেল এ গেছিলো, ভালো করে সে তো বোধয় মায়ের মুখের দিকেও তাকায়নি, প্যান্ডেলটা কি থিম করেছিল সেটাও মনে পড়ছে না। অদ্ভুত তো!! এই অভি যে যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় ও মহালয়ার পর থেকেই পাড়ার প্যান্ডেলেই পরে থাকতো সারাদিন। পুজোর চাঁদা তোলা থেকে কুমারটুলি থেকে প্রতিমা আনাতে- সব কিছুতেই অভি এগিয়ে থাকতো; আর এতো বছর পর সেই পুজোর সময় এসে অভি তেমন ভাবে কোনো টানই অনুভব করলো তার পাড়ার পুজোর প্রতি, কেমন যেন নিজের প্রতি একটু লজ্জিত লাগলো তার। প্রবাসের পুজোর রীতি নীতিতেই সে যেন বেশি অভস্থ হয়ে গেছে - মোটামুটি প্রবাসে পড়ার সূত্রে বা কাজের ক্ষেত্রে যে সব আমেরিকার শহর গুলোতে অভি ছিল, সব জায়গায়তেই মোটামুটি একই নিয়ম, সাধারণত শনিবার আর রবিবার পুজো আয়োজন হয়ে থাকে, সকলেই এ দেশে কর্মব্যস্ত, তাই উইকেন্ডেই মায়ের আরাধনা হয়। “তুমি দেখেছো?”, জিজ্ঞেস করলো অভি ক্যাব ড্রাইভারকে।

“হ্যাঁ দাদা, এবার তো আমরা একটা চ্যানেল থেকে অ্যাওয়ার্ড ও পেয়েছি”, বললো ক্যাব ড্রাইভারটা। আমাদের পুজো !! কথাটা কেমন যেন কানে বাজলো অভির। অভি ফোন থেকে চোখ সরিয়ে দেখলো সামনের দিকে, মানে টা কি ??

“তুমি এই এদিকেই থাকো নাকি?” জিজ্ঞেস করলো অভি।

“হ্যাঁ দাদা,” বলে ড্রাইভার একবারের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে অভিকে দেখলো, তারপর একটু থেমে বললো :

“দাদা আমি দীপেন, চিনতে পারছেন না?”

“দীপেন, মানে আমাদের দিপু? তুই ক্যাব চালাচ্ছিস?” হটাৎ করে বলে উঠলো অভি, বলেই কোথাও যেন আটকে গেলো সে..যদিও অনেক বছর অভি বাড়ি ছাড়া, তাও সে চিনতে পারেনি দীপেন কে !! তাদের পাড়ার ছেলে, ছোটবেলায় কত না খেলেছে সব এক সাথে, সেই দিপু !!

কেমন আছিস?”, জিজ্ঞেস করলো অভি। “বাড়িতে সবাই ভালো ?”

“হ্যাঁ দাদা, চলে যাচ্ছে ” উত্তর দিলো দিপু। “বাড়িতে এখন কেবল আমি আর মা, বাবা তো সেই মারা গেলেন যেই বছর তুমি বিদেশ গেলে তার পরের বছরই , ৩ বছর হলো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে ওই বেহালার দিকে। ”

অভির মনে পড়লো, দিপু দারুন ক্রিকেট খেলতো ছোটবেলায়, তাদের টিমের বলা যেতে পারে ষ্টার প্লেয়ার !! দিপুর মা আর বাবা কেও তার ভালোই মনে আছে, তাদের বাড়ির ঠিক পেছনের বস্তির শুরুতেই তারা থাকতো।

“কাকুর কি হয়েছিল?” জিজ্ঞেস করলো অভি। “ওই tuberculosis হয়েছিল।” জবাব দিলো দিপু।

“তুমি বোধয় অনেক বছর পরে ফিরলে তাই না গো? কাকুর সাথে মাঝে মধ্যে দেখা হয় রাস্তায়, মনে হয় হাঁটুর ব্যাথাটা বেড়েছে ওনার, বেশ কষ্ট করেই বাজার করতে যান, কাকিমাও তো শুনলাম অসুস্থ হয়েছিলেন মাস দুয়েক আগে। তোমাদের দেশে তো নিয়ে যেতে পারো কাকু কাকিমা কে, ওখানে নিশ্চয়ই ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।”

অনেক গুলো কথা বলে ফেললো দিপু।

“তোমাদের দেশ !! ” কথাটা কেমন যেন কানে বাঁধলো অভির, এটা কি তাহলে ওর দেশ না ? কাগজে কলমে নাগরিৎ পাওয়া রাষ্ট্র কি তার মাতৃভূমি রাষ্ট্রকে পরাস্ত করেছে!!

হ্যাঁ অভি আজকে US সিটিজেন, কিন্তু মন কি সেটা মেনে নিয়েছে? সে কি কখনো পারবে ইন্ডিয়াতে “বিদেশীর ” মতো আসতে? পারবে তার নিজের শহর কলকাতাকে একটা অন্য দেশের একটা শহর হিসেবে দেখতে??

এই নাগরিৎ নেওয়া নিয়েও অভির মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল একটা সময়, কিন্তু অভির বন্ধুবান্ধব, ওখানের চেনা পরিচিত মোটামুটি সবাই তাকে বলেছিলো, “এটার জন্যই তো এখানে আসা, যে যতই বলুক দেশে ফিরে যাবো, কজন সত্যি যায় বলতো??



এখন যা পরিস্থিতি হয়েছে, একবার নাগরিক হয়ে গেলে সব সমস্যার শেষ। আচ্ছা, সত্যি কি সমস্যা শেষ হয়েছে ?? অভির বাড়িতেও তার মা বাবা তাকে বলেছিলো এপ্লিকেশনটা করে ফেলতে দেরি না করে, তারা কি সেদিন সত্যি মন থেকে খুশি হয়েছিল? সেই নাগরিকের এপ্লিকেশন করার আরেক মানে কি এটা ছিল না - তাদের ছেলে আর কোনোদিন ও এই দেশে ফিরবে না, তাদের নিজের ছেলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, এক সাথে থাকাটা একটা নিয়মের ফেরে বার্ষিক একটা আয়োজন হয়ে থাকবে সারাটা জীবন!! সেই নিয়মেও এখন ফাটল ধরেছে, কাজের চাপে অভি নিজের বাড়ি আসতে পারলো প্রায় সাত বছর পরে, কিরকম হাস্যকর না - নিজের বাড়ি ফিরলো কিন্তু নিজের দেশে না !!

অভি যে তার মা বাবাকে ওই দেশে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি তা নয়, কিন্তু মনে হয়েছে এই বয়সে তারা কি সত্যি এডজাস্ট করে নিতে পারবে ওখানে?? অভি নিজে কি করেছে বা করে চলেছে - অ্যাডজাস্টমেন্ট না একসেপটান্স? তারা এতো দূরে থেকেও কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে না??

তার বাবার "knee replacement" সার্জেরীর সময় অভি একটা কনফারেন্সে ফ্রান্সে ছিল, আসতে পারেনি, ভিডিও কল করেছিল। এখন ও বাবার হাটুতে ব্যাথা সেটা তো অভি জানতো না! বাবা ও তো কিছু বললো না তাকে। মার শরীর যে ভালো যাচ্ছিলো না সেটা সে শুনেছিলো, কিন্তু তেমন কিছু সিরিয়াস হলে তো তাকে মা অন্তত বলতো। কিন্তু দিপু যে বললো দু মাস আগে মার শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছিল, মা ও তাকে কিছু বললো না! কেন? সে শুধু কিছুদিনের জন্য এসেছে বলে ?

"দাদা, জানেন পরিতোষদারা আর থাকে না, রাজারহাটে ফ্লাট কিনেছে শুনলাম কাকিমার থেকে।" দিপুর কথায় অভির চিন্তার বাঁধ ভাঙলো যেন।

পরিতোষ, সায়ন্তন, অভি তিন মূর্তি ছিল তাদের পাড়ার। এক সাথে স্কুল করেছে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত, তারপর সায়ন্তন চলে গেলো বেঙ্গালুরুতে আর পরিতোষ ভর্তি হলো প্রেসিডেন্সিতে। কলেজ জীবনের পর পরিতোষ চাকরি নিয়ে চলে যায় দিল্লীতে, আর অভি চলে আসে US তে মাস্টার্স করার জন্য। তারপর থেকেই আর তেমন যোগাযোগ ছিল না ওদের সাথে, ফেসবুকে দেখে ছিল পরিতোষ বিয়ে করেছিল বেশ কিছু বছর আগে, একটা মেয়ে ও হয়েছিল তাদের। তাহলে পরিতোষ কলকাতায় ফিরে এসেছে এখন। ইসস, আগে জানলে হয়তো দেখা করতো একবার, আশ্চর্য !! এই দিপুর কথা শুনে তার পরিতোষকে মনে পড়ছে, কিন্তু এই দুটো সপ্তাহে তার বাড়ির উল্টো দিকে পরিতোষের বাড়ি দেখে তো একবারের জন্য মনে হয়নি তার কথা! কিছুটা অন্যমনোঙ্কক হয়েই অভি বলে উঠলো:"অনেক কিছু বদলে গেছে।"

"হা যা বলেছেন দাদা, এখন তো মহালয়া থেকে মানুষের ঠাকুর দেখা শুরু হয় আর শেষ হয় দশমীতে।" বললো দিপু। "তবে আমাদের ভালোই ব্যবসা হয়ে জানেন তো এই সময়, খারাপ লাগে কি জানেন, বেচারি মাকে নিয়ে আর বেরোতে পারি না, তবে এই আপনার এই ট্রিপটাই লাস্ট নিলাম, তারপর বাড়ি গিয়ে মাকে নিয়ে বেরোবো একটু। জানেন দাদা গত বছর আপনার মা, পরিতোষদার মা আর দুজন কাকিমা কে নিয়ে পুরো কলকাতায় ঘুরিয়েছিলাম আমার ক্যাবে করে সপ্তমীর সকালে। "না, অভি এইসব কিছুই জানে না, পুজো এখন তার কাছে শুধু একটা কমিউনিটি "উইকেন্ড" ইভেন্ট, যেখানে চেনা পরিচিত প্রবাসী বাঙালিদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ , খাওয়া দাওয়া আর এই কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত আর্টিস্টদের শো দেখা, ব্যাস! নস্টালজিয়া, ইমোশন এই গুলো যেন ছোটবেলার স্মৃতিই রয়ে গেছে।



জানলা দিয়ে বাইরে দেখলো অভি, যেন জনসমুদ্র, ঠিক যেমনটা আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ছিল, সেই শেষ তার কলকাতায় পুজো। তাহলে সময় সব কিছুকে বদলাতে পারে না !!

"দাদা, আবার কবে আসবেন?" জিজ্ঞেস করলো অভি। "জানি না", কিছুটা নিজের অজান্তেই বলে ফেললো অভি। আজ সকালে মাও তাকে একই প্রশ্ন করেছিল, "বাবু আবার কবে আসবি রে?" মার ভেতরের বিষন্নতা কোথায় যেন ধরা দিছিলো এই প্রশ্নের ভেতরে, তাও যতটা সংযত থাকা যায়, সেই চেষ্টাই করছিল; অভি সেটা বুঝেছিলো ঠিকই, কিন্তু তার কাছে কোনো উত্তর ছিল না। অফিসের যে পরিমাণ দায়িত্ব তার ওপর আছে, সেখান থেকে ছুটি নেওয়ার কথাই প্রায় সে ভাবতে পারেনা। সাধারণত লং উইকেন্ড হলে, চেনা পরিচিতদের দল হয়ে যায় ওখানে কোথায় ঘুরতে যাওয়ার, অভির কাছে এটাই এখন "break from work" বা রিলাক্সেশন। দেশে ফেরা, নাহ অনেক ঝামেলা !! সত্যি কি এই জন্যেই সে US তে এসেছিলো? একদিন নিজের দেশে ফেরাটাকে ঝামেলা মনে হবে ! হ্যাঁ দিপু কথায় অনুযায়ী এখন তো সে বিদেশি, NRI ও নয়, এটা তার দেশ ও না, ঠিকই আছে..." কেমন ইনকাম হয় তোর দিপু ক্যাব চালিয়ে? এটা কি তোর নিজের গাড়ি?" জিজ্ঞেস করলো অভি। "গত বছর কিনলাম দাদা লোন নিয়ে। তার আগে মালিকের গাড়ি চালাতাম। তেলের দাম কেটে কিছু তেমন আয় হতো না দাদা।" তবে যেই টুকু বাবার জমানো ছিল আর আমি যতটা বাঁচিয়েছিলাম পুরোটাই প্রায় বাবার চিকিৎসায় আর বোনের বিয়েতে চলে গেলো। তাই একটু সময় লাগলো নিজের গাড়ি কিনতে।"



কত সাবলীলভাবে দিপু কথা বলছে অভির সাথে, নিজের আর্থিক অবস্থা সব কিছুই সে বলে যাচ্ছে অকপটে। অভি কি পারবে এইভাবে বলতে সব কিছু? এতো বছরে কাউকে কিছু না বলে, একাকিত্বটাই শোয়ে গেছে যেন। এই দুটো সপ্তাহে তার কতটুকুই বা কথা হয়েছে মা আর বাবার সাথে? কথা কি ফুরিয়ে গেছে নাকি এই দূরত্বটা একটা অদৃশ্য প্রাচীর বানিয়েছে? চারিদিকের এতো ভিড়ের মধ্যেও অভি যেন একাই থেকে গেছে ...

দেখতে দেখতে শ্রীভূমির ভিড় কাটিয়ে ক্যাব এগিয়ে চললো, কেন জানিনা অভির এবার মন খারাপ করতে লাগলো, আর হয়তো পনেরোটা মিনিট, তারপরই সে পৌঁছে যাবে তার গন্ত্যবে, ফিরে যাবে তার ব্যস্ত সম্পদশালী বৃত্তে, কতটা আলাদা তার ব্যস্ততাটা এই মানুষজনদের কাছ থেকে, দিপু ভাবছে তাকে ফিরে গিয়ে মাকে নিয়ে বেরোতে হবে; অভির কেন জানি না দিপু প্রতীক্ষা হলো, শেষ যে কবে সে মা বাবার সাথে একসাথে কোথায় গেলিছিলো, মনেই পরে না আর ...ব্যস্ততা আর টানাপোড়েন!!

এয়ারপোর্টে গাড়ির লম্বা লাইন, সবাই ফিরছে, দশমীর আগেই যেন বাড়ি ফেরার তাড়া, অভি কি জানে তার কিসের তাড়া? এতো বছর ধরে সে শুধু ছুটেই গেছে, এখন কেন জানি না মনে হচ্ছে সবার থেকে এগোতে গিয়ে সে একাই থেকে গেছে!!

এতো বছর ধরে সে প্রবাসে পুজোতে গেছে, আড্ডা ও মেরেছে, কিন্তু শেষের দিন তো এই অনুভূতিটা কখনো হয়নি !! পরের দিন সকালে উঠে নিয়ম মতো অফিস গেছে, আজকে এতো বছর পরে কলকাতায় ফিরে কেন সে এতটা মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে?? কেন?

"দাদা, তোমার কি টার্মিনাল ৪বি?", জিজ্ঞেস করলো দিপু। "ওহ! হ্যা, এসে গেছে?", অভির যেন হৃৎ ফিরে পেলো।

"দাড়াও আমি লাগ্জ গুলো নামিয়ে দিচ্ছি।", বললো দিপু।

"দিপু, তোর হোয়াটস্যাপ নম্বরটা আমায় একটু দিবি?" জিজ্ঞেস করলো অভি।

"হ্যা, নাও না, ৯৮৬..", কেন গো? ", অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো দিপু।

"না, যদি তোর অসুবিধে না থাকে তাহলে মাঝে মধ্যে একটু মা বাবার খবর নেবো, সব সময় তো আমাকে ওরা বলে না কি অসুবিধে হয়েছে, তুই একটু দেখিস আর তোর কাছেও আমার নম্বরটা থাকলো, যদি কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে জানাবি।", বললো অভি। "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই দাদা। তুমি চিন্তা করো না", আমি তো আছি এখানেই, ক্যাব নিয়ে যতদূরেই থাকি না কেন ১ ঘন্টার মধ্যেই চলে আসতে পারবো।" সত্যিই দিপু পারবে ক্যাব চালিয়ে ১ ঘন্টার মধ্যে বিপদে আপদে তার মা বাবার কাছে পৌঁছে যেতে, কিন্তু অভি সেটা পারবে না !! সে কিনা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সিনিয়র ডিরেক্টর !! তার কি এইসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলে চলে ! সে তো জীবনে সাকসেস পেয়েছে, কি মূল্যে পেয়েছে সেটা আজকে হয়তো বুঝতে পারছে ... রাইড শেয়ার এপ্লিকেশন কমপ্লিট করে অভি নেমে দাঁড়ালো তার শহর কলকাতার বুকে, আর একবার তার সেই চেনা শহরটাকে দেখে নিয়ে ঢুকে গেলো গেট দিয়ে। তার মতো অনেকেই এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে সঙ্গে আসা আত্মীয় পরিজনদের, সে শুধু একবার দিপুকে দেখে ভেতরে ঢুকে গেলো, দিপুর এখন অনেক তাড়া বাড়ি ফেরার। সিকিউরিটি চেকিং এর পর ফোনটা খুলে বাবাকে ফোন করলো অভি। "বাবা, অভি বলছি।" ওপর প্রান্ত থেকে অভি শুনলো, "হ্যা রে বল, পৌঁছে গেছিস? আমি আর তোর মা ওটাই চিন্তা করছিলাম, পূজোর দিনে রাস্তায় না আটকে যাস! যাক, সাবধানে যাস, পৌঁছে একটু জানিয়ে দিস - আমাদের..., কি করবো বল চিন্তা হয় তো, তাই আর কি..."

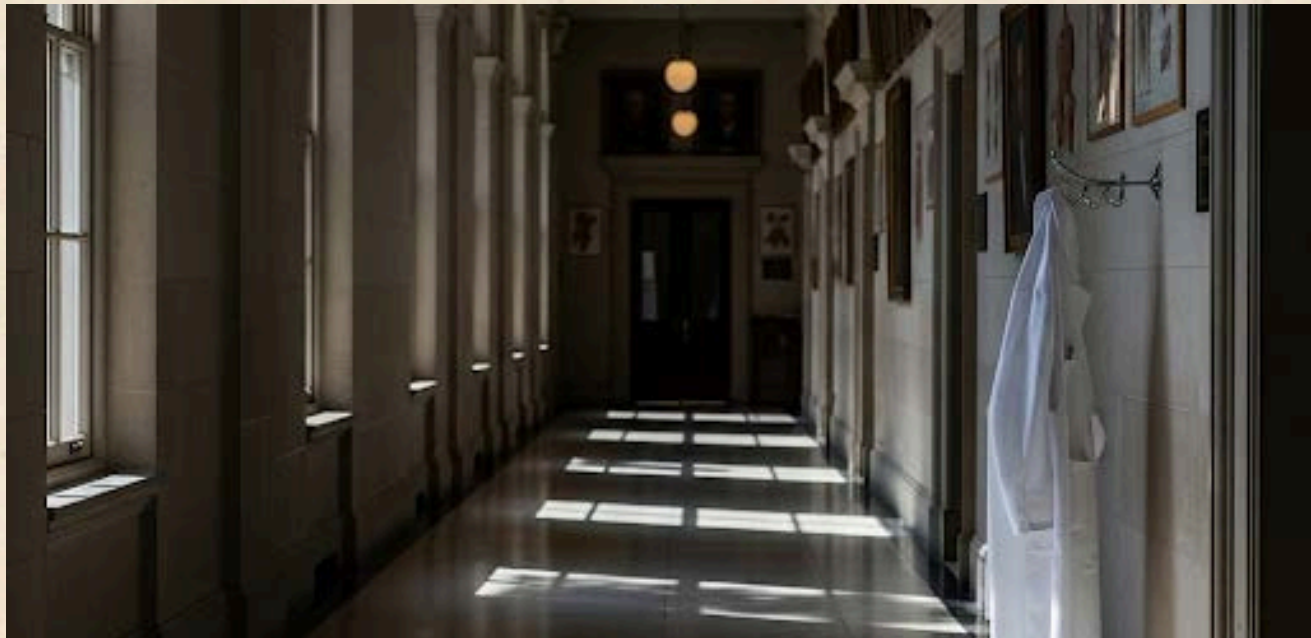


অভির হটাৎ কেন জানি যেন খুব কান্না পেলো, চিন্তা !! তার জন্য এখন মা-বাবার চিন্তা হয়, সন্তান কখনোই তার মা-বাবার কাছে বড় হয়ে ওঠে না, সামাজিক মানদন্ডে সে যতই সফল হোক না কেন, কিন্তু তার মতো "সাকসেসফুল" সন্তানরা কেন মনে করে শুধু অর্থ দিয়েই সব দায়িত্ব পালন করা যায় !! যখন তারা শুধু সন্তানদের স্বানিদ্ধটুকুই কামনা করে !! "বাবা, পরের বছর আমি ৩ উইকের ছুটি নিয়ে আসব, এই ভাবে না। আমরা তিনজন মিলে একটু পাহাড়ে ঘুরতে যাবো, তোমাদের ও ভালো লাগবে, আমার ও। বাবা, আমি খুব ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত। একটু আরাম চাই, একটু ঘুমোতে চাই বাবা। আমিও চাই এই ডিমাল্ডিং পরিবেশ থেকে একটু হলেও বাইরে আসতে, কিন্তু ভয় পাই গো... যদি অন্য কেউ এগিয়ে যায়?? আমি যদি পিছিয়ে পড়ি ? তাহলে কি হবে ??" অভি এইসব বলতে চেয়েছিলো বাবা কে, কিন্তু ফোনে আর সেটা বলতে পারলো না, কিন্তু তাও যেন শুনতে পেলো বাবা বলছে, "ওরে তুই এতো চিন্তা করিস না, যেটা অর্জন করেছিস সেটা উপভোগ কর, পিছিয়ে পড়ার ভয়ে নিয়ে জীবন কাটাস না রে !! পরের বছর চলে আস, চল সবাই মিলে ঘুরে আসি সেই আগের মতন !! দেখবি জীবন মানে শুধু দৌড়নো নয় রে ! জীবনে ওঠা নামা থাকবে রে, সেটা কে স্বীকার করতে ভয় কোথায়? কিন্তু যেটা থাকবে না সেটা হলো এই সময়টা, তাই এতো ভাবিস না অভি! জীবনটাকে উপভোগ কর !!" অভি শুনতে পেলো, এয়ার হোস্টেস বোর্ডিং স্টার্ট হওয়ার ঘোষণা করছে। তার মনের টানাপোড়েন কে ছাপিয়ে বাস্তবের পথে যাওয়ার জন্য উঠে পড়লো অভি, শুধু ফোনে বললো "আসছি আমি, তোমরা সাবধানে থেকো।" অভি কিছোট্টা যেন হালকা লাগছে, পরের বছর সে ঠিক চলে আসবে ছুটি নিয়ে - তার শহরে, তার আপনজনদের কাছে, এখনো মানুষ আছে সে, AI রোবট হয়ে যায়নি।



I Called It My Alma Mater – Until That Night

A Graduate's Reckoning from R.G. Kar Medical College



A Second Childhood in White Coats

A neonatologist was born in those corridors. Not just a doctor - a purpose, a calling, a voice. My journey at RGK Medical College began with awe and ambition. I was driven by the desire to serve newborns, to master the fragile science of life that begins before a first breath is taken. RGK offered everything - brilliant clinical exposure, a depth of pathology that fascinated, and mentors who left fingerprints on my soul. It wasn't just a college. It was a second home. A second childhood that spanned into adulthood. In those years, we broke and healed, we laughed through 3 a.m. ward rounds, and we became the people the world would later call "Doctor." Medical school is not a chapter - it is a transformation. RGK was the womb that shaped mine. It gave me my voice, my fight, my identity.

The Night That Shattered Everything

On August 8, 2024, I was thousands of miles away. It was evening where I lived. My dinner was waiting, my laptop finally put to rest, and my phone began to buzz with urgency - alumni messages, frantic updates, rumors. A postgrad doctor had

been found dead in RGK. They called it suicide. But soon, the silence broke. The reports that followed stole the breath from my lungs. A young doctor - brilliant, dedicated, deeply committed - had been raped, tortured, and murdered in a seminar hall I once studied in. Her mouth bled. Her eyes, her body, her soul - all bore the marks of unspeakable violence. And she had been alone - just as many of us once were during those exhausting night shifts in rooms no one checked. That night, my alma mater failed her. And in doing so, it failed all of us.

When Grief Turns to Reckoning

In the days that followed, the country erupted. Protests shook Kolkata. Doctors across India marched. A principal resigned. An officer delayed the FIR. The courts intervened. The media stormed. Celebrities spoke. But none of it erased what had already happened. The place that once taught me to hold life gently in my palms had now been marked by a death so brutal it stained not only its walls - but its very soul. And yet, amid all this, I sat grieving a memory. RGK wasn't just the scene of a crime - it was the place I once held sacred. The library where I studied for anatomy viva. The benches where we consoled each other after failed exams. The canteen where laughter and arguments flowed in equal measure. The same walls that taught me discipline and resilience had now betrayed everything I believed in. I couldn't reconcile my pride with this betrayal. She wore the same white coat. She stood where I once stood. Her dreams were ones I once dreamed. And yet, she died in silence. She was not protected. She was not believed. She was not saved. I kept asking myself: what if it had been me?

The Day the World Shattered With Us

The world didn't just watch. It ruptured. Across continents, in hospital lounges, operating rooms, and alumni chats, the news of August 9th landed like a thunderclap. What had been unimaginable became heartbreakingly real. She was one of us. She could have been any of us. She was all of us. In the silence that followed, I found myself spiraling back to the very beginning - when I got my admission letter to RGK. My parents had cried with pride. 'Our daughter, in a prestigious government medical college,' they said to relatives near and far. 'She will serve the world, she will touch lives, she will become someone whose hands heal and whose name matters.' They imagined wise professors, inspiring doctors, noble ideals, and a future where their daughter would rise - no longer just theirs, but someone the world would call Doctor. And I imagine Abhaya's parents did too. They must have sent that same photo in the white coat to cousins abroad. They must have whispered to themselves,

Look what she's becoming. A gift to the world. They must have believed she was protected by the very system she had dedicated her life to. Until that system failed her - in the most horrific, unimaginable way. What broke on August 9th wasn't just a young woman's life. It was the illusion that women in medicine - trained to be more than human, taught to push through pain, exhaustion, and pressure - could thrive in systems that still refused to protect their most basic dignity.

A Daughter's Plea

I write not as a physician, but as a daughter of RGK. For fifteen years, I spoke proudly of where I came from. But now, I speak of what must change. We must not be proud without being responsible. We must not be silent when safety is compromised. Our institutions must protect, not just train. We must demand safe corridors, transparent leadership, real policies for harassment and abuse, and a culture that listens before tragedy forces our hand. We owe it to those who come after us to build safer campuses, stronger systems, and kinder communities. We owe it to those who trusted the institution with their futures - and their lives. We owe it to her. Because if her death becomes just another chapter, then we've all failed her again.

Let Her Name Mean Something

Let her name - whether known to the world or not - stand for something greater. Let it become the rallying cry for every woman in medicine who dares to demand safety, dignity, and justice. Let it be a reminder that silence is no longer an option, that our institutions must be held accountable, and that we are never too small to speak truth to power. For those of us who still walk hospital halls and wear the weight of white coats, may her story ignite our courage. Let her name inspire us to look out for one another, to speak up when it's hard, and to rebuild a system where no one is ever alone again. She fought - and through us, she still does.



Indrani Bhattacharjee, MD
Neonatologist,
Boston Children's Hospital
Alumna, R.G. Kar Medical College

জীবনস্মৃতি

মধুশ্রী মজুমদার

সোহাগ সেন আজ একজন প্রবীণ নাগরিক। জীবন যুদ্ধের এক পোড় খাওয়া সৈনিক। প্রায় চল্লিশ বছর কলকাতার বুকে একটি High School এ শিক্ষকতা করেছেন। আজ উনি অবসরপ্রাপ্ত, অবকাশ মুহূর্ত বাঙ্গয় হয়ে ওঠে অতীতের স্মৃতি রোমন্বনে। খুব বেশী করে মনে নাড়া দেয় শৈশবের মধুর দিনগুলি। তবে, যে আপন জনেরা তার শৈশব ঘিরে ছিল তারা কেউ ই আর এই পৃথিবীতে নেই। তাই জীবনে চলার পথে মন টা খুবই ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আজকাল শিশুরা খেলতে ও জানে না। খেলার মাঠে হারতে শেখে না বলেই আজকের শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটে না। তাই, ভবিষ্যতে সামান্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সোহাগ সেন তাই তার school এ co- curricular activities এর উপর খুব জোর দিতেন। নিজে তো school এ এবং পাড়ায় খুব খেলাধুলা করতেন। কত বন্ধু ছিল। ভীষণ ভাবে মনে পড়ে বার্ষিক পরীক্ষার পরে শীতের সকালে বন্ধুদের সাথে Badminton খেলার স্মৃতি। নিজে এক সন্তান হলেও ঠাকুমা, পিসি, কাকা সবার মাঝেই সোহাগ সেন বড় হয়েছিলেন।

ব কাছ থেকে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের দেখেছেন। তাঁদের মাঝে ছিল প্রকৃত আদর্শ আর শিক্ষা। School, College এর সুন্দর মুহূর্তের অনেক টুকরো টুকরো ছবি প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সর্বশ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হয়েছিল University Life এর দুটো বছর। Calcutta University র College Street Campus ছাত্র রাজনীতির পীঠস্থান। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে masters করেছেন সোহাগ সেন। ছাত্রী খুবই ভালো ছিলেন। University র Professor রা কি অসাধারণ পড়াতেন। তাঁদের কি profound knowledge - Karl Marx, Lenin, Engels এর political Philosophy র সাথে Mahatma Gandhi র Philosophy র তুলনা। Karl Marx এর “The Communist Manifesto”,

class- struggle, Socialism, Capitalism - সোহাগ সেন মন দিয়ে class এ পড়া শোনে। জীবনকে তখন নতুন আঙ্গিকে দেখা শুরু করেছেন। অবকাশে University Canteen, Coffee House, পুঁটিরামে এ টুঁ মারা তো আছেই।

হয়ত কিছু ভালবাসার পরশ ও লেগেছিল জীবনে। হয়ত সেই অনুভূতি অব্যক্তই রয়ে গিয়েছে চিরকাল। আমাদের জীবন দেবতা ই তো সোহাগ সেন কে শিখিয়েছেন ভালবাসার জাদুমন্ত্র। Reference work এর জন্য যেতে হত University Central Library অথবা National Library তে। National Library র উন্মুক্ত সবুজ পরিবেশ আর এত বই এর সম্ভার, Annex building এ এত magazine, আর সর্বোপরি College Street এর বই পাড়া! এত মূল্যবান বই এত সুলভ মূল্যে পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় বলে সোহাগের মনে পড়ে না।

সোহাগ সেনের বাবা ও মা দুজনেই Central Government এ উচ্চপদে চাকরী করতেন। তাই ভ্রমণের অনেক সুবিধা পেতেন। সর্বোপরি, সোহাগ সেনের বাবা অত্যন্ত ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছিলেন। তাই সোহাগ সেন তার বাবা মার সাথে Kashmir থেকে Kanyakumari, Arunachal Pradesh থেকে, Gujrat প্রায় সবই ভ্রমণ করেছেন। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যতান। ধর্ম, ভাষা, পোষাক, খাদ্য সব বিষয়ে ভারতবাসীর মাঝে এত বিভেদ হলেও 'India offers Unity in Diversity'. Varanasi, Haridwar এ মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে হিন্দু সভ্যতার মাহাত্ম্য আবার সারা Lucknow শহরের ধুলিকণার সাথে জড়িত মুসলিম নবাবী ঐতিহ্য। সোহাগ খুব ছেলেবেলায় গিয়েছিলেন Amritsar এ। Amritsar এর Golden Temple দেখে ছোট্ট সোহাগ আনন্দে অভিভূত। শিখ্ ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে Amritsar পবিত্র তীর্থস্থান। শৈশবের দিনগুলিতে সোহাগ অবাক হয়ে ভাবত ভারতবর্ষ কত বিরাট দেশ আর কত বিভিন্ন ধর্মের মানুষ - আর সবাই কত স্বাধীন ভাবে বসবাস করছে। College এ পড়াকালীন একবার রাজস্থানে গিয়েছিলেন, সেটা

ছিল October মাস। থর মরুভূমির অসাধারণ রূপ - জয়সলমীরে সোনার কেলা। October মাস, সবে শীতের আমেজ এসেছে মরুভূমিতে - দারুণ উপভোগ্য weather। জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর এ ঝলমলে দুর্গ প্রাসাদ। ভারতবর্ষ খুব ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেশ। রাজস্থানের স্থাপত্য শিল্প রাজপুত রাজাদের আমলে গড়ে উঠেছিল - আবার কিছু প্রাসাদ, দুর্গ মোগল আমলের। মরুভূমির বুকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। class four এ পড়তে Darjeeling এ এসেছিল সোহাগ তখন 'Tiger Hill' এ সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। Tiger Hill থেকে সূর্যোদয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য সোহাগ এর মনে আজীবন গচ্ছিত থাকবে।

Year টা ছিল 1982/83, University তে Masters এর final year - সোহাগ এসেছিল Kashmir এ। তখন তো এত terrorist attack এর আতংক ছিল না। তাই Kashmir সত্যিই ছিল 'Heaven on earth'। Srinagar, Pahalgam, Sonmarg, Gulmarg - সব যেন শুধুই Canvas এ আঁকা নানারকম রঙের ছবি। Dull.lake এ শিকারায় ভ্রমণ, Shalimar Gardens এ light and sound programme, Pahalgam এর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য, Sonmarg ঐতিহাসিক গুরুত্ব পূর্ণ স্থান। আর, Gulmarg এ সোহাগ এর ঘোড়ার পিঠে ওঠার অভিজ্ঞতা।

স্মৃতির সরণি বেয়ে মনে পড়ে যায়, Allahabad এ Tribeni Sangam এ দুই মায়ের গঙ্গা স্নান। মায়াদের মুখের হাসি দেখে সেদিন সোহাগ আর সুজয় সেন অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেছিলেন। সোহাগ সেনের husband, অধ্যাপক সুজয় সেন বেশ 7/8 years Bombay IIT র Civil Engineering Dept. এ visiting professor ছিলেন। সোহাগ সেখানে প্রায়ই যেতেন। সুজয় সেনের flat টা ছিল 22nd floor এ। সামনে Powai lake, দূরে পাহাড়, কত বৃক্ষরাশি, চারিপাশে সবুজ আর রঙীন ফুলের সম্ভার। lake এর জলে কতরকম রঙিন মাছ আর সাদা রাজহাঁস। সোহাগ বিস্ময়ে অভিভূত - প্রাকৃতিক এত বিপুল সম্ভারের মাঝে মাথা উঁচু করে সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববন্দিত এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সোহাগ সেন বিভোর

হয়ে ভাবতেন, 'বিজ্ঞান আর প্রকৃতির মাঝে কি অপূর্বমেলবন্ধন'।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে হয় সুন্দরবন ভ্রমণের কথা। 'The Royal Bengal Tiger'- এর স্মৃতি কি ভোলা যায়? আর launch এ করে সুন্দরবনের নদীতে বর্ষায় ইলিশ উৎসব। এই স্মৃতিগুলোই সোহাগ সেনের জীবনে অনেক ভালো লাগার পরশ নিয়ে আসে। স্মৃতিগুলো William Wordsworth এর কথায়, The 'bliss of solitude'.

এবার খুব বৃষ্টি। আষাঢ় মাসের আগে থেকেই অঝোরে সারাদিন ধরে বৃষ্টি। এখন ও প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি। এখন শ্রাবণের প্রায় শেষ। আজ সকাল থেকেই আকাশ টা খুবই মেঘলা। আজ মনটা খুবই উদাসীন। তার মাঝে অবশ্য সকালেই USA থেকে নাতি নাতনিকে video তে অনেকক্ষণ দেখে তাদের সাথে কথা বলে মন টা কিছুটা হাল্কা বোধ হচ্ছে। একটু ঠান্ডা লেগেছে বলে গরম গরম আদা চা এর কাপে চুমুক দিয়ে সোহাগ এর মনে পড়ে যায়, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে নিঃসৃত ঝরণা। এত নিরিবিলি পরিবেশে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সুধা পান করে সোহাগ ধন্য। সন্দের আলো আঁধারিতে সোহাগ, সুজয় আর তাদের বন্ধুরা মিলে উপভোগ করেছিলেন পুরুলিয়ার আদিবাসীদের 'ছৌ নাচ'।

পুরানো গানের মাঝে এক nostalgic আবেদন আছে। লতার গলায়, "Rangeela Re Tere Rang Mein --" , অথবা, "নিবুন্ম সন্ধ্যায় শ্রান্ত পাখিরা--" গান গুলি শুনলে একবার পূজোতে Delhi তে ছিলেন সোহাগ সেই স্মৃতি মনে পড়ে যায়। Delhi, Agra এই শহর গুলোর মাঝে এক ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। মোগল আমলের অনেক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এই শহর গুলোর মাঝে পাওয়া যায়। Agra র Taj Mahal তো তার সৌন্দর্য আর ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য বিশ্ববন্দিত।

শীতের বিকেলে অথবা কুয়াশা স্নাত সকালে বড় ভীষণ ভাবে মনে পড়ে যায়, Pondicherry র Arobindo Ashram এর কথা। সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই আশ্রম।

সম্পূর্ণ নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে অরবিন্দ আশ্রমে এসে সোহাগ এর মনে হয়েছিল ভবিষ্যত জীবনে সংসার থেকে অব্যাহতি নিয়ে এখানেই আশ্রয় নেবেন। মনে হয়, ডুয়ার্সের এর জঙ্গল এর অভয়ারণ্য আর বন্যপ্রাণীদের সৌন্দর্য। পৌষ- মাঘের সকালে মনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে যায়, শান্তিনিকেতনের অনাবিল আনন্দের স্মৃতি। সুজয় সেনের সাথে বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন সোহাগ সেন। কোনবার হয়ত academic purpose, কোনবার হয়ত শুধুই বেড়াতে। শান্তিনিকেতনে প্রকৃতি যেন কথা বলে। চারপাশে সবুজ আর সবুজ। আকাশে, বাতাসে যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব। রামকিংকর বেইজ এর অসাধারণ ভাস্কর্য শান্তিনিকেতনের আর এক ঐতিহ্য।

সোহাগ ইতিহাসের ছাত্রী এবং শিক্ষিকা। তাই, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য তাকে চিরকালই এক অমোঘ টানে আকর্ষণ করে। 'বিভেদের মাঝে ঐক্য' - ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। বহু যুগ ধরে বহু সংস্কৃতির মিলনে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আমাদের জীবন দেবতা তো বলেছেন, "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"। "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

স্মৃতিচারণের সরণি ধরে ভেসে আসে বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতি। আমেরিকা ভ্রমণ তো বাঙ্গালীর জীবনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সার্থক হল 1988 এ। USA এর Urbana Champaign এ University of Illinois এ Visiting Scientist হয়ে গিয়েছিলেন Prof. সুজয় সেন। সোহাগ তখন রাতুল, মিতুল কে নিয়ে USA তে একই সাথে ছিলেন। রাতুল USA তে Kindergarten School এ পড়ল আর মিতুল USA তেই জন্মগ্রহণ করেছিল। সোহাগ নিজেও "South East Asian History" র উপরে ওখানকার Parkland College এ দুটো semester course করেছিল। সোহাগ সেন সেবার বছর তিনেক আমেরিকাতে ছিলেন। তার মাঝে Bengali Association এর member, week- end এ party, cultural programme এ participate করা আর সর্বোপরি সুজয় সেন এর

অসম্ভব ব্যস্ততাময় জীবন। অধ্যাপক সুজয় সেন বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই প্রখ্যাত, University/ Institute এ visiting Professor অথবা Visiting scientist হয়ে visit করেছেন কখন long term কখনও বা short term basis এ। তবে, সোহাগ তার পরিবার, নিজের school আর দু ছেলের পড়াশুনোকে বাদ দিয়ে সুজয় এর সাথে বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন নি। পরবর্তী কালে, বড় ছেলে রাতুল কে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকবার আমেরিকাতে এসেছেন। একবার আসার পথে, Canada হয়ে এসেছিলেন সোহাগ। Canada র, Toronto তে সোহাগ এর প্রাণের প্রিয় ছোট কাকা থাকেন। সপ্তাহ দুয়েক ছিলেন সোহাগ Canada তে। সময়টা সুন্দর ছবির মত কেটেছিল। আর সেই অসাধারণ মুহূর্তকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল, "Niagara Falls"- কি বিশাল জলরাশি, "Niagara Falls" এত সুন্দর কারণ, জলপ্রপাতের শব্দ, জলের প্রবাহ এবং চরিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য সবার মনকেই সহজে আকৃষ্ট করে। রাতের বেলা জলপ্রপাত টিকে আলোয় আলোকিত করে তোলা হয়। সেই মায়ারী আলোর ঝলমলে রূপ - সোহাগ সেন যেন বিস্ময়ে অভিভূত, আনন্দে আত্মহারা।

রাতুল এখন বিশ্বের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক। রাতুল Stanford university র PhD. সোহাগ সেন, সুজয় সেন Convocation ceremony তে এসেছিলেন। Convocation এ এত বড় মাপের Professor/Scientist দের কাছ থেকে দেখার, কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, সোহাগ সেন ধন্য। ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। আমেরিকার বড় বড় শহর ঘুরেছেন, অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে গিয়েছেন। আর দেখেছেন বিশ্বের সেরা সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। University of Illinois, University of Central Florida, Stanford University, Berkeley, Harvard, MIT. ছেলেবেলা থেকেই academic life এর পরিবেশ টাই খুব ভাল লাগত সোহাগের। বিয়েও হয়েছিল মনোনীত পরিবেশে।

সোহাগ এর জীবনটা আজ পরিপূর্ণ, তিনি ধন্য, আবেগে আত্মত। তাও জীবন সায়াছে এসে শৈশবের দিকে ফিরে তাকালে, কোন কিছুকে হারানোর বেদনা মনের মাঝে তীব্র ভাবে অনুভূত হয়। অনেক প্রাপ্তির মাঝে কিছুটা

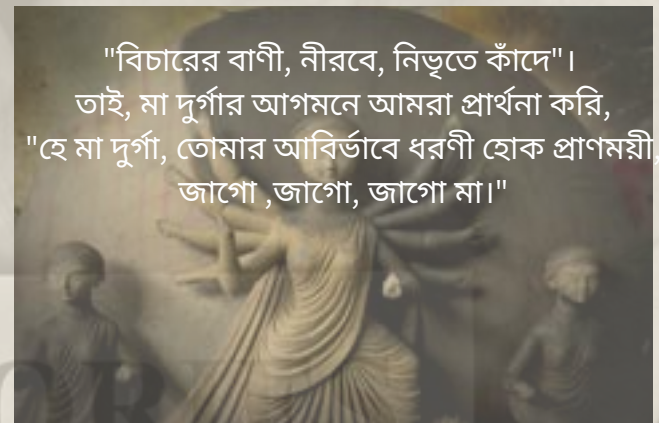
অপ্রাপ্তি মনটাকে তীব্র বেদনায় ভরিয়ে তোলে। সেই শূন্যতা ভোলার নয়। সেই যে কবিগুরু বলেছেন, "তুই, ফেলে এসেছিস্ করে, মন মন রে আমার, তাই, জনম গেল শান্তি পেলি না রে, মন মন রে আমার।" রবীন্দ্রনাথের কাছে ভালোবাসাটাই হচ্ছে আসলে এক অতৃপ্তির সাধনা। মিলন নয়, বিরহেই হল প্রেমের আসল সার্থকতা।

বর্তমানে, সোহাগ দূরে কোথাও ভ্রমণের ইচ্ছে পোষণ করেন না। যখন ইচ্ছে হয়, তখন কিছু বন্ধুদের সাথে, Nandan, Madhusudan Mancha, South City র Inox এ কোন মনের মত programme, movie দেখতে যান। মাঝে মাঝে, মনটা যখন কিছুটা দার্শনিক হয়ে যায়, তখন সোহাগ বন্ধুদের সাথে অথবা সুজয় এর সাথে গাড়ি করে চলে আসেন বেলেড় মঠে অথবা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে। বেলেড় মঠের সন্ধ্যা আরতি সোহাগ এর সেই ছেলেবেলার থেকেই খুব প্রিয়। আর, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মা ভবতারিণী মন্দিরে পূজো দিতে খুব পছন্দ করেন সোহাগ। আর সন্ধ্যা বেলায় নাটমন্দিরে বসে সন্ধ্যা আরতি দেখা। বাড়ির পাশে Goalpark, Ramkrisha Mission এ মাঝে মাঝেই চলে আসেন। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তে খুব ভালো বাসেন সোহাগ।

আজকাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনে সোহাগ আর সুজয় দুজনেই। সোহাগ এর blood- pressure আর blood- sugar level দুটোই high, তাই ইদানিং নিয়ম করে Rabindra Sarobar lake এ evening walk করতে যান। কখনো একা, কখনো সুজয় সেনের সাথে আবার কোনসময় সাথী জুটে যায় কিছু বন্ধু। সোহাগ প্রায়ই ফুচকা খেতে দক্ষিণাপণের সামনে চলে যান। Chinese food খেতে আজও খুব ভালবাসেন সোহাগ। শৈশবের সব ভালবাসা গুলো নিয়ে আজও তার প্রিয় শহর কলকাতা তে সুন্দর ভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে তার। আর উৎসব ! "India is a land of festivals" ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন

ধর্মের মানুষের বসবাস। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সোহাগের প্রিয় শহর কলকাতাতেই সারা বছর ব্যাপী অনুষ্ঠান। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান - দুর্গাপূজো। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় আগমনীর বার্তা। নীল আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। সবুজ মাঠে সাদা কাশ ফুলের সমারোহ। কলকাতার বাঙ্গালীর দুর্গাপূজো এখন বিশ্বের দরবারে পূজিত। In 2021, The UNESCO accorded kolkata Durga Puja as an Intangible Cultural Heritage, শৈল্পিক উৎসব হিসেবে কলকাতার দুর্গাপূজা অনন্য। অত্যন্ত নান্দনিক ভাবে নকশা করা মন্ডপ আর অভিনব আলোকসজ্জা, অসাধারণ প্রতিমা কলকাতা দুর্গাপূজার অভিনবত্ব। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন পোষাক পরিধান করে পূজোর কটা দিন আনন্দে মেতে ওঠে। বিসর্জনের দিন Carnival অনুষ্ঠান সবার কাছেই খুব আকর্ষণীয়। দুর্গাপূজোর অর্থ অশুভ কে দমন করে শুভর জয় ধ্বনি ঘোষণা করা।

R.G.Kar এ ডাক্তারী ছাত্রীর "অভয়া" মৃত্যুর আজও কোনো সুরাহা হল না। দিকে দিকে, বিশ্বজুড়ে কত নির্যাতিতা তাদের উপর অত্যাচারের কোন বিচার হয় না। জগত সংসারে কত অনিয়ম, অবিচার ঘটে চলেছে এরই বা বিচার কোথায়?



"বিচারের বাণী, নীরবে, নিভূতে কাঁদে"।
তাই, মা দুর্গার আগমনে আমরা প্রার্থনা করি,
"হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী,
জাগো, জাগো, জাগো মা!"



রাগ কোরোনা রাগুনী, রাঙা মাথায় চিরুনি বর আসবে এম্ফুনি নিয়ে যাবে তম্ফুনি।

এখন রাগ-অভিমানের দূরত্ব ২৭ ফিট। রাগ হলে একই বাড়িতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে দূরের আর এক ঘরে যাওয়া, তারপর ঘরে ঢুকে দরজার আগল টেনে বসে থাকা। এই দুই ঘরের দূরত্ব ২৭ ফিট।

এবার একটু খোলসা করে বলি। এখন আমরা যেখানে থাকি সেটা রীতিমত এক গ্রাম, যাকে ছোটবেলায় অজ পাড়াগাঁ বলতাম অনেকটা তেমনই। এখানে রাস্তায় কোনো আলো নেই, চারদিকে অনেক বড়বড় গাছ। রাতের বেলা বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আর ঝাঁ ঝাঁ পোকাকার ডাক। মাঝে মাঝে শেয়াল বা নেকড়ের ছোট্টাছুটি। আমার একটা গাড়ি আছে, আমি চালাতেও পারি, কিন্তু এই অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে রাগ দেখাতে যাব, সে সাহস কোথায়? তারওপর এই শহরের পুলিশদেরও খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই। তারা অসময়ে কোনো গাড়ি দেখলেই তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করবে, "Are you alright? Do you need anything madam?"

কি করে বলি যে আমার রাগ হয়েছে তাই একটু গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। নাহঃ অতটা চেষ্টাও করিনি, কারণ অন্ধকারের ভয় আমার ছোটখেকেই।

আজ যে ঘটনাটা বলব সে আমাদের যৌথজীবনের প্রথম দিকের গল্প। তখন আমরা বড় শহরে থাকতাম, এপার্টমেন্ট বাড়ির ১০ তলায়। বাইরে সারাক্ষন লোক গমগম করছে, রাস্তাও আলো ঝকঝকে ল্যাম্পপোস্টের আলোয়, তাই রাগের দূরত্ব কম করেও ১০ তলা তো ছিলোই। আজকের গল্পটা সেই 'এলেম নতুন দেশের' প্রথম রাগের গল্প।!



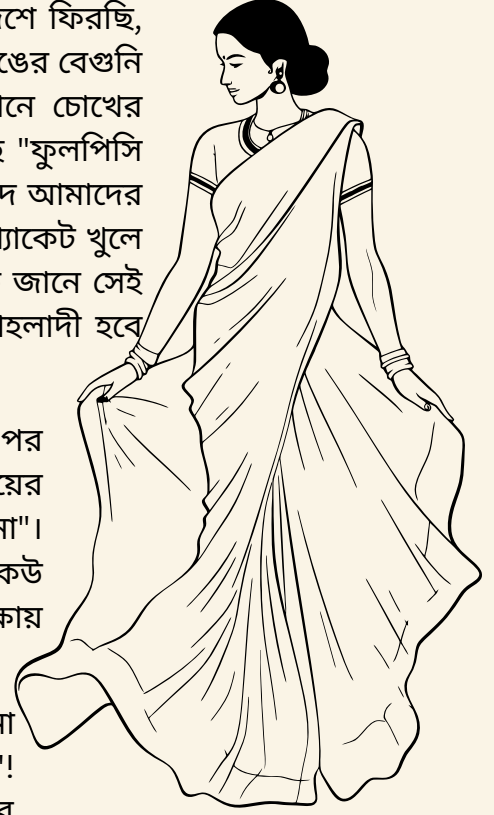
স্বপ্না রায়

আমাকে যারা ছোট্টা থেকে চেনে, তারাই জানে আমি কেমন আদরে-বাঁদর, জেদি, একগুঁয়ে, রাগী আর বায়নাদার। তবে এগুলোর জন্যে আমি কিন্তু দায়ী নয়। আমাকে এইভাবেই বড় হতে দেওয়া হয়েছে। যা চাই তাই পেতে হবে নাহলেই ঘ্যানর ঘ্যান। এটা আমার বেশ বড় বয়েস অবধি ছিল।

তখন আমি রবিতীর্থে গান শিখি। কোনো একটা অনুষ্ঠানের জন্যে বিশেষ একটা দোকান থেকে শাড়ি কিনতে বলা হয়েছিল। আমি সবসময় ফুলপিসির ভ্যানিটিব্যাগ (অথবা উল্টোটা, ফুলপিসি আমার ভ্যানিটিব্যাগ) হয়ে ঘুরতাম। আমি যেমন সাজতে ভালবাসতাম, আমার পিসি ঠিক তার উল্টো। ভালো শাড়ি ছাড়া আর কিছু পড়তো না। বালা, দুল, আংটি হার কিচ্ছু না শুধু একটা ঘড়ি।

শাড়ির দোকানে গিয়ে স্বভাবতই আমি ঝুলে পড়লুম অন্য আর একটা শাড়িও আমার পছন্দ। ফুলপিসির ইচ্ছে না থাকলেও সে শাড়ি কিনতে বাধ্য হল। এবার আমার আবদার ম্যাচিং সায়া চাই। পিসি যত বলে, "বাড়িতে ওই রঙের সায়া আছে"। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। আমার চাই-ই-চাই। সেলস ম্যান ভদ্রলোক আমার নাছোড়বান্দাগিরি দেখে পাশের সেলস ম্যান কে ফিসফিসিয়ে বলছেন, "বিধবা মায়ের মেয়ে তবু একটু মায়ের কষ্ট বোঝেনা। এ কেমন করে মেয়ে মানুষ করছেন কে জানে"। দোকান থেকে বেরিয়ে ফুলপিসি বলে, "দেখলি তো? তোর বায়নাদারির জন্যে আমার বিয়ে না হয়েও আমাকে বিধবা করে দিল।" আসলে পিসির মাথায় সিঁদুর নেই, কপালে টিপও নেই, ঘড়ি ছাড়া গলা হাত খালি, তাই তারা ধরেই নিয়েছে ফুলপিসি বিধবা।

এবার আর একটা আন্দারের কথা বলি! একবার দেশ থেকে এদেশে ফিরছি, এয়ারপোর্টে এক ভদ্রমহিলা একটা তসরের শাড়ি পড়েছিল, ঘিয়ে রঙের বেগুনি পাড়ের সুন্দর দেখতে। আমার প্রত্যেকবার দেশ থেকে ফেরা মানে চোখের জলের বন্যা। তার মাঝেই একবার বোধহয় মুখফুটে বলে ফেলেছি "ফুলপিসি দেখ শাড়িটা কি সুন্দর"। ব্যাস হয়ে গেল। ফিরে আসার ৫ মাস বাদে আমাদের এক বন্ধু দেশ থেকে ফিরলো আমার জন্যে একটা প্যাকেট নিয়ে। প্যাকেট খুলে অবাক হবার পালা, সেই একই শাড়ি সঙ্গে ম্যাচিং সায়া ব্লাউস। কে জানে সেই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে কি না? এমন মেয়ে যে আহলাদী হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?



যাইহোক ছোটবেলায় আমার রাগ হলেই তিনতলার ছাদের ওপর ঠাকুরঘরে গিয়ে আমি বসে থাকতুম। আমার জ্যেষ্ঠ বলতো, "মেয়ের বিয়ে দেবার সময় দেখতে হবে ছাদে একটা গাঁসা ঘর আছে কি না"। আমি রাগ হলেই নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যেতুম। জানতাম কেউ না কেউ আসবেই বাবা- বাছা করে নিচে নামিয়ে আনতে। সেটারই অপেক্ষায় কান খাড়া করে বসে থাকতুম।

এতো গেলো ছোটবেলার রাগ। বড় হয়ে কোনো কিছু আমার মতে না মিললে বা রাগ হলেই একটি পেটেন্ট বাক্য, "আমি আজ খাবনা"! এমনিতেই ছোটো থেকে খাবার নিয়ে আমার ঝামেলা ছিল, তার ওপর খাবনা বলার মধ্যে বাড়ির সবাইকে বেশ একটা জব্দ করার অভিপ্রায় ছিল। একমাত্র আমার মা (আসলে আমার ঠাকুমা) যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসতুম, আর যার চোখে আমার সব দোষ মাপ, সেই পারতো আমার রাগ ভাঙাতে।

সেই আমি সবাইকে ছেড়ে, সব আদর আবদার গোঁয়ারতুমী শিকেয় তুলে বরের সঙ্গে এদেশে চলে এলাম। প্রথম প্রথম তো ঝগড়া হত না, তখন নতুন করে জানা চেনা তাতে রাগ হবার খুব একটা সুযোগ ছিল না। যখন দুজনে থাকতাম কিছু মনে হত না, একা হলেই শুধু মন খারাপ বাড়ির জন্যে, মার জন্যে, বৌদি (আমার জন্মদাত্রী মা), বাবা, পিসি কাকা জাম্মা জ্যেষ্ঠ সর্ব্বার জন্যে। এমনকি আমাদের বাড়িতে কাজ করতো পবন গগন রতন ওদের জন্যেও। আমরা তখন Washington State এ থাকতাম। তারপর Boston এ চলে এলাম।

তখন আমরা কেমব্রিজের একটা কম পয়সার (subsidised) এপার্টমেন্টের ১০ তলায় থাকতাম। তার ওপরেই ছাদ। সেটা কম পয়সার ভাড়া বাড়ি বলে ওটা ছিল বাঙালি পোস্টডকদের কলোনি। বাঙালিটোলাও বলা যেতে পারে। আমরা ১৭ টা ফ্যামিলি ছিলাম। বিদেশের ছোটোখাটো একটা দুর্গা পূজো করার মতো মানুষজন ওই ফ্ল্যাট বাড়িতে ছিল। তবে এখানে ভাড়া নেবার জন্যে তিনটি শর্ত ছিল! কোনো ছানা পোনা থাকবে না, কোনো পোষ্য থাকবেনা আর তোমায় গরিব হতে হবে। আমাদের কোনোই অসুবিধে হয় নি, সবগুলোতেই ১০০%। আর একটা ভালো ব্যাপার ওই বাড়িটায়। ওখানে আমাদের বেশ কিছু দাদা-দিদি ছিল। মোটামুটি সবাই আমাদের থেকে বড় আর অনেকেই আমাদের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের।



সুতরাং আবার স্নেহডোর। আবার আদর আবদার। কারু বাড়ি ভালো কিছু রান্না হলেই, "আহা মেয়েটা রান্না করতে পারেনা" বলে আমাদের জন্যে বাটি করে চলে আসতো। যে কোনো বাড়িতেই অবাধ যাতায়াত। বাড়িতে ভাইফোঁটা করলাম, আমার একগাদা গিফট হলো। সুতরাং আমার উপমা (আদরে-বাঁদর, আহ্লাদী ও বায়নাদার) বদল হবার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

সবই ঠিক ছিল, কিন্তু আমার রাগ? সেটা কার ওপর দেখাবো? আর বুঝবেই বা কে? ছাদের গৌঁসা ঘরের কথা ভুলে যাও কুল্যে একটাই তো ঘর, তা সেটাও আবার চিলে কোঠায়। রাগ করে যাবই বা কোথায় আর রাগটা বুঝবেই বা কে? কিন্তু কথায় আছে, স্বভাব যায় না মলে আর ইজ্জত যায় না ধুলে। সুতরাং রাগ আমার হলো আর সেই নিয়েই আজকের গল্প।

তখন আমরা দুজনেই MIT তে কাজ করতাম। সকালে বেরোতাম, রাহুল, আমার বর ড্রাইভ করতে আর আমি ঘুমোতে ঘুমোতে যেতাম। ওখানে লাঞ্চের সময় একসঙ্গে দেখা হতো, খেতামও একসঙ্গে। তারপর বাড়ি ফেরা একসঙ্গে। আমি ড্রাইভ করতে পারতাম না, সেখার ইচ্ছেও ছিল না (তার কারণ আমাদের বাড়িতে হারুকাকা আমাদের গাড়ি চালাতো। একবার হারুকাকাকে বলেছিলাম আমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিতে। হারুকাকার বক্তব্য, খুকুমা তুমি যদি গাড়ি চালাও তাহলে আমার চাকরি যাবে।) সেই ভেবেই প্রথমের দিকের ১০-১১ বছর আমি গাড়ি চালাতে শিখিনি। মনে ভাবতাম, আহা রে রাহুলের চাকরিটা যাবে। তাই যাবার সময় ঘুমোতে ঘুমোতে আর ফেরার সময় বই পড়তে পড়তে ফিরতাম। এরপর বাড়ি ফিরেও রান্না করা, খাওয়া সবই একসঙ্গে। সুতরাং সারাদিনে এমন কোনো সময় ছিল না যে রাগ দেখাব, কারণ সারাক্ষণই তো আর একজনের ওপর ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু তাই বলে রাগ তো থেমে থাকবেনা।

কদিন ধরেই একটা বিশেষ ব্যাপারে আমার প্রচন্ড রাগ হচ্ছিলো। আর যার ওপর রাগ সে কিছুতেই বুঝতে পারছিলনা যে আমার রাগ হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে সেটা প্রকাশ করবো। যেহেতু তার সঙ্গেই যাচ্ছি - আসছি, খাচ্ছি সুতরাং মনে হচ্ছে সবই স্বাভাবিক, সবটাই শুধু ভালোবাসার।



এবার একটু ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে আসি। আমাদের সবার লিভিংরুম কিচেন আর বেডরুমের জানলা বাড়ির সামনের দিকে, যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়। সুতরাং আমরা ল্যাবের থেকে ফিরে আলো জ্বালা দেখে পার্কিং লট থেকেই বলে দিতে পারতাম যে কোন কোন ফ্ল্যাটে মানুষজন বাড়ি ফিরে এসেছে। বেশির ভাগই MIT র লোক। আর একটা ব্যাপার, আমাদের লিফ্ট ছিল কিন্তু ফায়ার অ্যালার্ম বাজলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হতো। তবে বিশেষত্ব এই যে সিঁড়ির দরজা

দিয়ে বেরোনো যায় কিন্তু ঢোকা যায়না। আর সিঁড়ির আলোটা জেনারেটর দিয়ে জ্বলে motion sensitive, কেউ সিঁড়িতে গেলেই আলো জ্বলে ওঠে। এবার সেদিনের গল্পে ফিরে আসা যাক। সকালে ল্যাবে একসঙ্গেই গেলাম, লাঞ্চও একসঙ্গে খেলাম বাড়ি ফিরে রান্নাও করলাম। আমার পেটে ব্যাথা বলে খাবার নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লাম। তখন আমার মনের মধ্যে রাগ আর উত্তেজনা মিশিয়ে একাকার কান্ড হচ্ছে। অনেক বিবেচনা করে দেখলাম, রাতের খাওয়ার পরই একমাত্র সময়। কারন তখন আমার বর বাসন ধোবে, খাবার ফ্রিজে ঢোকাবে, তারপর রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে মেজাজে সিগারেট খাবে। এটাই সুবর্ণ সুযোগ রাগ দেখাবার। যেই ও রান্নাঘর ঢুকেছে বাসন মাজতে আমি চটিটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বাইরের দরজাটা

আস্তেআস্তে বন্ধ করে সোজা সিঁড়িতে। ভয়ও করছে। দশ তলা থেকে একতলা পর্যন্ত সোজা সিঁড়ি নেমে গেছে, সেখানে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি চিরকালই ভীতু, বিশেষ করে ভূতের ভয়, চটিটা বুকে চেপে ধরে দুড়দুড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে একেবারে একতলা নেমেই সামনে দেখি পার্কিং লটে সার সার গাড়ি। কথায় আছে না, "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত?" আমার দৌড় ওই গাড়ি পর্যন্ত। আমাদের ছোট্ট লাল টয়োটা করোলা, সেই তখন আমার আশ্রয়দাতা। টুক করে তার ভেতরে গিয়ে বসে পড়লুম। ভাবটা এই যে এবার দেখি কেমন আমাকে খুঁজে পাও।



মনে মনে চাইছি না আবার চাইছিও যে কেউ আমার খোঁজ করুক (সেই ছোট্টো বেলার অভ্যেস যাবে কোথায়?)। ১৫ কি ২০ মিনিট হবে হঠাৎ দেখলাম আমাদের দশ তলার লিভিংরুমের জানলা দিয়ে আমার বর মাথা ঝুকিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। কিছুক্ষন বাদে ৭ তলায় বাঁশিদির জানলায় হরিদা আর বাঁশিদি। তার একটু পরেই মিলি আর বারীনদার জানলায় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। বুঝতে পারলাম যে একজন ঘরে ঘরে বার্তা পাঠাচ্ছে যে বউ হারিয়েছে।

হঠাৎ কিছুক্ষনের বিরতি। তারও কিছুক্ষন পর জানলার তিনমূর্তি নিচে নেমে এলো। বাইরে বেরিয়েই ফস ফস করে তিনটে সিগারেট জ্বালানো হয়ে গেল, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে হবে না? আমি টুক করে গাড়ির পেছনের সিটে চলে

গেলাম, যদি দেখতে পায় তাহলে সব প্ল্যানই মাটি। হরিদা আর বারীনদা হস্তদস্ত হয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেল আর আমার বর পার্কিং লটে আমাকে খুঁজতে লাগলো। প্রত্যেকটা গাড়ির পাশে গিয়ে নিচু হয়ে কি খুঁজছে কে জানে। আমি কি বেড়ালবাচ্চা না কুকুরছানা যে গাড়ির তলায় ঢুকে যাব? অথচ আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে গেল কিন্তু একবারও গাড়ির ভেতর দেখলো না।

গরু খোঁজার মতো খুঁজে তিনজনেই আবার বাড়িতে ঢুকে গেল। এবার আমার একটু ভয়ই করছিলো। কি রে বাবা কতক্ষন বসে থাকবো? তাহলে কি আমি নিজেই বাড়ি ফিরে যাব? এতদূর তো ভেবে দেখিনি, এর পরের স্টেপ যে কি হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ আবার দৃশ্য বদল। রাহুল আর বারীনদা নেমে এলো। এবার গাড়ির দিকে দুজনেই আসছে, কে জানে টের পেয়ে গেল নাকি যে আমি গাড়িতে আছি? আমি গাড়ির পেছনের সিটের সামনের পা রাখার জায়গায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লুম যাতে কেউ না দেখতে পায়। ঠিক যা ভেবেছি তাই। ওরা দুজনে গাড়িতে বসে স্টার্ট দিল। বারীনদা, "আমার গাড়িতে গেলেই হতো, রাহুল তোমার এত টেনশনে গাড়ি না চালালেই পারতে"। আমি মনে মনে ভাবছি, ভাগ্যে আমাদের গাড়িতে উঠেছিল নাহলে আরো কতক্ষন একা থাকতে হত কে জানে? ওরা বেরিয়েই বাড়ির চারপাশে একবার ঘুরে এলো তারপর সামনের গলি Walden street দিয়ে গিয়ে একেবারে ম্যাসাচুসেটস এভেন্যু তে পড়ল।

আমার বরের যেমন বুদ্ধি, আমি কি অতদূর এই রাতের বেলা একা একা যেতে পারি?

এই কথাই বারীনদা ওকে বলছিল, "স্বপ্না রাগ করতে পারে এটাই আমার জানা ছিল না, আর সে রাগ করে এতদূর চলে আসবে এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছেনা।" আর তেনার বক্তব্য, "তুমি জানো না বারীন, স্বপ্না কে দেখে ওরকম শান্ত মনে হয় কিন্তু রেগে গেলে ওর কোনো জ্ঞান থাকে না"। যত বাজে কথা, যেন আমার কত রাগ দেখেছে।



রাহুল একবার এ রাস্তায় একবার ও রাস্তায় ঢুকছে, আমিও পেছনের সিট থেকে মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখছি কোথা দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থেমে গেল বড় রাস্তার ওপর। হস্তদস্ত হয়ে নেমে গেলেন আমার ত্রাণকর্তা। বারীনদাও দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমিও পেছনের সিট থেকে উঁকি মারছি কি হচ্ছে দেখার জন্য। ওঃ হরি! রাস্তার পাশে এক জন হোমলেস মাথায় চাপা দিয়ে শুয়ে আছে আর রাহুল ভেবেছে ওটা আমি! বেচারি কে মাথার চাপা খুলে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। আবার দেখলাম ওয়ালেট থেকে টাকা বের করে দিল। আবার দুই মূর্তি গাড়িতে ফিরে এলো। গাড়ি স্টার্ট।

রাহুল, "এবার কি করবো বল? আমার আর মাথা কাজ করছেনা"! বলেই ফস করে আর একটা সিগারেট। বারীনদা, "একবার বাড়ি চলো, হয়তো বাড়িতেই লুকিয়ে আছে বা কোথাও গিয়ে থাকলে এতক্ষণে ফিরে এসেছে।" ড্রাইভার কোনো কথা না বলে গাড়ি চালাতে শুরু করলো, "নাঃ বারীন, এবার আমার সত্যি ভয় করছে, আমি ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি। আমার আর কোনো উপায় নেই। আমি থানায় যাচ্ছি ওখানে গিয়ে ওর নামে একটা ডাইরি করে দিয়ে আসি ---"।

আমি আর চুপ করে থাকি? এই পর্যন্ত শুনেই আমি পেছন থেকে ঝপাস করে সামনের দুজনের মাঝে বসে পড়লাম। এর বেশি দেরি করলে আমার বর আসামি শুদ্ধ গাড়ি নিয়ে থানায় গিয়ে হাজির হয়ে যেত। আর রাগ করে থাকলে হয় ?



But what is Shaktism, really?

Aritra Ghosh



As the Durga Puja descends upon us once more, one cannot help but be swept up in its revelry. However, one might occasionally wonder as to the significance of a particular ritual or symbol during it, only to be met with a rather intimidating collection of religious documents and scholarly articles upon research. When was the puja first celebrated? From whence came its veneration of the feminine, so unique among faiths? Why is it ten days, for that matter? Memorizing technical details of the puja can make for quite the thankless task, one reserved for enthusiasts; for the casual enquirer, among the most effective means to learn about more about the puja is learning of its context within the Hindu tradition of Shaktism. A sect dedicated to worship of Shakti - alternatively Devi or the Feminine Principle - as the supreme goddess and ultimate manifestation of reality, its mysterious origins and growth within Hinduism form the key to grasping this great celebration. With that said, from its prehistoric antecedents to its contemporary fame, what is Shaktism, exactly?

Worship of the Feminine Principle is a primordial faith, a peer of the most ancient shamanistic rites and, indeed, the animistic customs of nature worship. The cause for this is fairly evident - primordial man worshipped those powerful forces which were beyond his control, in hope of attaining their protection and enjoying the associated fruits. The sky was worshipped in hopes of rain, the earth was worshipped in hopes of bountiful forage or harvest, and the womb was likewise worshipped as the sole source of offspring. Pregnancy and childbirth were the loftiest mysteries to these ancestral peoples; they transformed the body and generated life, yet the process was fraught with danger and carried a high risk of mortality on the part of either mother or child.

Perhaps this experience of transformation, of fear and uncertainty, could have engendered the sense of divinity in fertility that later blossomed into the myriad goddess-cults?

Myriad is quite a fitting term in this regard, as the sheer extent of goddess worship across the ancient world is remarkable - across Eurasia, countless stone idols from the Neolithic era depict feminine figures with exaggerated bodily proportions, often concentrated together indicating organized worship. This extends even to the Indus Valley Civilization, where numerous female figurines were found in the households of large settlements - a phenomenon extending across society from the lowest to the highest social strata. Could there have been a popular cult of a primordial Mother Goddess in the Harappan Civilization, worshipped in the countryside and transmitted to the cities in a more organized form? One cannot be certain - after all, the social structure of the IVC remains shrouded in mystery, let alone the state of religion - but it may well be the basis of modern Shaktism originated in the birthplace of Indian civilization.

The Vedas, our first true record of religion in India, tell a rather different story about goddess worship. But first, some clarification about these venerable texts is in order; the Vedas are far from a unified collection of literature, in reality comprising several layers of oral traditions of the so-called “Aryan” peoples of India. Within the Rigveda, for instance, are found allusions to a religious order utterly detached from what is often viewed as a unified, “Brahmanical” religious order. In some shlokas Varuna rather than Indra is king of the gods, in others there is reference to a vague Dyáuṣpitṛ (skyfather) as the supreme god, married to Pṛthvī, earth-goddess. The latter is of particular note, as it brings us closest to the primordial faith of the Aryans prior to their migration into India during the Vedic period (c. 1500-600 BCE), where they intermixed with indigenous peoples and assimilated aspects of their beliefs. As stated in multiple Mandalas



(subordinate sections, or volumes) of the Rigveda, Mother Earth and the sky were once united, but were separated by the power of either Varuna or Indra. Connecting these natural forces to the lives of mortals, it is stated that the sky retains a connection with Earth through fertilizing rain, feeding the children of Pṛthvī and preserving order in the world.

Does the Vedic religion, then, also harbor a prototypical Shaktism? That would be far from the case, as despite vague stylistic similarities between both faiths, Vedic goddesses are depicted and venerated in language drastically differing from that of currently venerated Hindu goddesses. One could focus here on the lack of distinctively “Shaktist” imagery, namely geometric configurations in Vedic texts, but the difference between faiths can most effectively be described as one of perception. Shakti, or rather Parashakti (supreme shakti, often equated with the Brahman or Absolute reality), is associated with energy, activity and strength - it is no coincidence that the Sanskrit terms for both power and the Feminine Principle is shakti. In contrast, the most ancient layer of Vedic texts associate the feminine with passivity and the eternal. This association is clearest with the goddess Aditi, an ancient goddess from the second phase of Vedic religion (c. 1500-1100 BCE), where select non-Aryan elements were assimilated into religious practices and a clearer polytheistic pantheon was formed. Aditi is the personification of eternity and motherhood, being equated with Brahma as a representation of the omnipresent and eternal Brahman. Her nature is thus that of immanent serenity - an appropriate position for the Brahmanical religion, which valued the exact transmission of religious rites and the repeated performance of yajñas (rituals) above spiritual introspection.

It is difficult to see this depiction of femininity reflected in contemporary Hinduism, filled with goddesses who are famed for their great powers, terrifying deeds or both at once. Even the latter stage of Vedic faith (c. 1100-600 BCE), wherein goddesses such as Śrī (Lakshmi), Vāc (goddess of speech, conflated with Saraswati) attained great popularity, did not alter this static perception of the Feminine. None of the texts attributed to Shaktism originate from this period, nor do Shakta myths bear mention in the Ramayana. The situation would drastically change during the “second urbanization” of India following the pastoralist Vedic age (c. 600-200). Not only was this era one of immense political transformation, but it was also the age of the śramaṇas (mendicants adhering to non-Vedic schools of thought), the age of Gautama Buddha and thus an age of decline for Vedic ritualism. In order to persist, the Brahmanical religion was stirred to adapt, which it accomplished through the adoption of deities and customs formerly considered peripheral to Aryan culture - the rites of tribal groups such as the pisachas (primitive fishermen) or dravidas (inhabitants of Southern India) found acceptance within religious literature in a Sanskritised context.

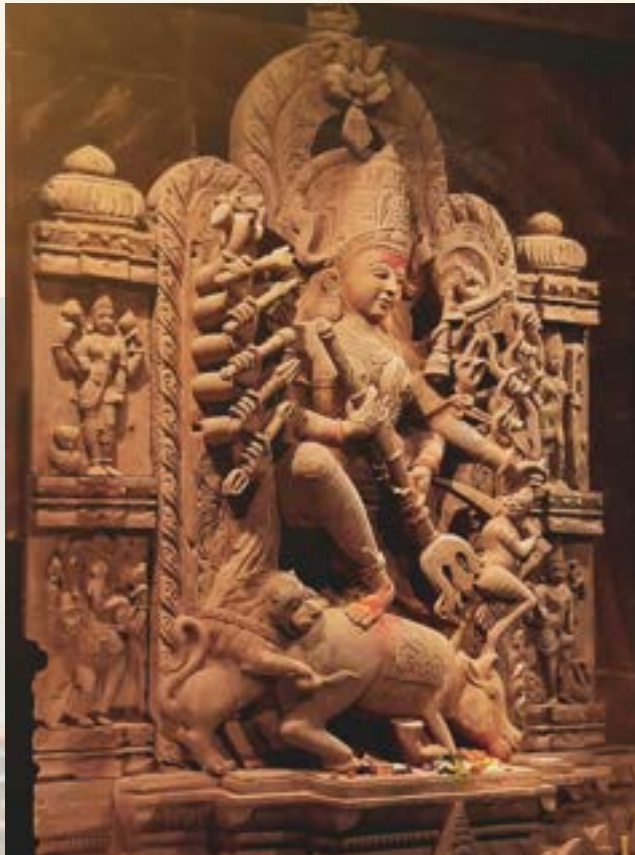
A process beginning by the end of the Vedic period, the consequences of this synthesis are immediately visible in mandala 10 of the Rig Veda, largely considered on linguistic and hermeneutic grounds as being of later formation than the other sections. It contains the famed Devīsūktam, or hymn to the Goddess, hailing Devi as the supreme power, creator of reality and the gods by consequence of her maternal nature. It is no exaggeration to state that this text forms the basis of modern Shaktism, lauding the energy of Devi as guiding even Rudra, incarnation of Shiva. This seminal work would be followed over the following centuries by the introduction of a sizeable pantheon of goddesses into the Hindu corpus, most notable among whom is, of course, the goddess Durga. While there exist multiple theories as to the age and geographic origin of Durga, her earliest recorded appearances already emphasize her might, protective nature and synonymy with Shakti.



By the time of the Gupta Empire (c.300-600 CE), under which the voluminous literature of Puranas were compiled, the same motifs used to describe Durga were extended to other goddesses, with each goddess being viewed as a manifestation of Mahadevi (the supreme goddess, highest form of Shakti) and possessing equal dignity to the gods. With the maturation of Shaktism, several parallels were made by devotees with other strains of

Hinduism to emphasize its coherence, for instance the existence of seven Matrikas (mothers), female versions of prominent goddess, and the Tridevi, a feminine equivalent of the Trimurti (triad of Brahma, Vishnu and Shiva) with Saraswati, Lakshmi and Parvati. Above even these supreme goddesses is the Mahadevi, equated with the nirguna (unbound, without limiting qualities) Brahman. The foremost of Shakta texts, the Devi Mahatmya, was composed during this period and serves as a consolidation of these various trends in Shaktism, recounting the characteristics and deeds of multiple goddesses. Most important among its numerous stories is the battle between the goddess Durga and the buffalo demon Mahishasura, unkillable by any man. Unable to defeat him, the gods gather together their spiritual powers to produce Durga, who after a battle of nine days, slays the demon in a symbolic triumph of order over disorder, with the tenth day being reserved for celebration. This magnificent episode, among the most celebrated in Hinduism, forms the basis of the Durga Puja, continuing to this day.

The Mahatmya is but one of the numerous Shakta texts composed during the Gupta era, with the Devi Purana and Mandarkeya Purana in particular giving great emphasis to Shakta beliefs and philosophy. Beyond the Puranas lie vast region of tantra also, with Shaktism being among the variants of Hinduism closest tied to the esoteric tradition. It is from this tradition that the ten Mahavidyas, fearsome goddesses fond of meat and liquor, emerge, with the goddess Kali at the forefront. That is not all, as the ages have seen the creation of a monumental collection of devotional and philosophical Shakta literature, with the sheer popularity of the tradition ensuring its continued success in all regions of Hinduism.



Today Shaktism is the third largest Hindu denomination, with its Shakti Pithas (pilgrimage sites) receiving millions of visitors annually. Its tales and tenets have been praised by Ramakrishna and Vivekananda; its sacred days are celebrated time and time again in the form of pujas; it is at once upon the paths of dakṣiṇācāra (right-hand, or orthodox faith) vāmācāra (left-hand, or tantric practice). Every aspect of Hindu thought may be found within it, and in return it has contributed many unique concepts to that vast gestalt. May its teachings persist for generations to come, may its goddesses be celebrated just as they have long been, and as we pay homage to Durga, Lakshmi and Saraswati on this occasion, may our devotion to them bring us the blessings of the Supreme Goddess.



Six Yards of Memory

A PERSONAL AND CULTURAL TRIBUTE TO THE KANJEEVARAM SAREE

By Jayati (Das) Sadhukhan



A Rain-Soaked Beginning

The saree - six yards of elegance, grace, and quiet power - has always mesmerized me. Yet my first encounter with it was anything but graceful.

I was fifteen and a half, newly admitted to Class 11 at Patha Bhavan, Kolkata. Our high school uniform for girls was a white saree with a blue border. It was July in the early '80s, and the monsoon had arrived in full force. My daily commute involved two crowded buses and a ten-minute walk.

On the first day of school, I was drenched. The unpinned pleats of my saree came undone, floating like a dhoti in the muddy street water. Mortified and nearly in tears, I stood frozen.

But I was a resilient teenager. I gathered myself, tucked the wet pleats into my petticoat, and walked on. With daily practice, I mastered the art of wearing my uniform saree. That year, during Durga Puja, my parents gifted me a yellow and black block-printed silk saree. Suddenly, I felt like an adult.

Until then, my Durga Puja attire had been dresses (or “frocks,” as we called them), skirts, and pants. But in that saree, I felt seen. The neighborhood boys noticed, and as a teenager, I quietly enjoyed the attention.

For teenagers growing up in 1980s Kolkata, that feeling was transformative. We discovered poems by Joy Goswami and Pablo Neruda through our beloved math teacher, Pinaki-da. We boasted when classmates landed roles in Satyajit Ray's Ghare Baire. We felt important when invited to the premiere of Fatikchand, Sandip Ray's directorial debut - though we were more excited about watching Pikoo, a short film by Satyajit Ray that explored adult themes. We even snuck into Rodin's exhibition at Birla Academy in 1983, feeling worldly and grown-up.

Even later in life, when I saw Rodin's sculptures in Paris or at Stanford's sculpture park, nothing matched the joy of seeing them as teenagers with friends. That nostalgia still lingers.

The Saree as a Canvas

This isn't just a story about adolescence - it's a tribute to the artistry behind Indian sarees. For me, each saree tells a story: the imagination of the artist, the craftsmanship of the weaver, and the emotions woven into its threads. A saree is the largest canvas for an artist's creativity.

Weaving techniques vary across regions, shaped by local history, dynasties, and the availability of fabrics and silks. The essence of a saree's allure lies in the meticulous artistry of handloom and handwoven craftsmanship.

The word sari originates from the Sanskrit saadi, meaning "a strip of cloth." Sarees have journeyed through centuries, dating back to the Indus Valley Civilization around 2800 BCE. For Indian women, a saree is not just attire - it's an extension of identity.

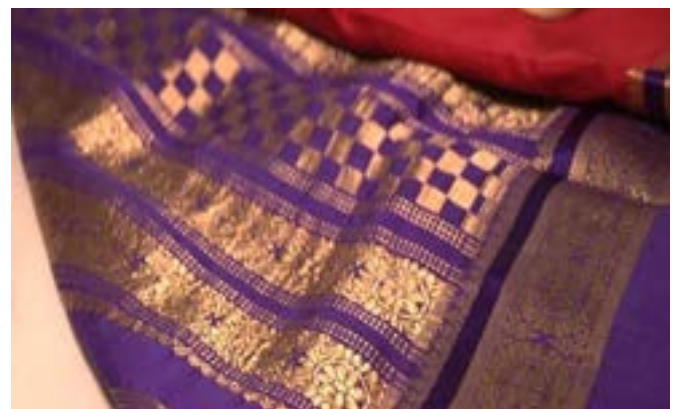
My First Kanjeevaram: A Saree and a Memory

This tale is dedicated to the Kanjeevaram saree. As a Bengali, I could have started with Baluchari or Jamdani, but my heart chose Kanjeevaram.

The story begins nearly fifty years ago with my Ma. I inherited a stunning dark red Kanjeevaram saree with a purple border and intricate pure gold zari. Ma bought it for my pishi's wedding in December 1975. Though Bona pishi wasn't biologically related, she and Ma shared a deep bond.



We had just moved to Calcutta in September 1975, and Ma was thrilled to attend a family wedding after years of living away. She bought the saree from Bhojraj - a store now nearly seventy years old. I still remember, as a nine-year-old, how radiant she looked. I felt special when I helped her organize her pleats. Every time I touch that saree, I feel her presence. It's more than fabric - it's memory.



The Craft of Kanjeevaram

Kanjeevaram silk sarees, also known as Kanchipuram silks, hail from the town of Kanchipuram in Tamil Nadu. They are woven with pure mulberry silk and zari - gold or silver threads. The designs draw inspiration from temple architecture, mythology, and nature, often featuring contrasting borders and ornate pallus. Traditionally worn for weddings, religious ceremonies, and festivals, these sarees are symbols of auspiciousness and celebration.

Before weaving begins, the silk yarn is dipped in rice water and sun-dried to enhance thickness and stiffness. Once dried, the off-white threads are dyed in vibrant hues. The ornate pallus and borders are woven separately and joined to the body using the *Korvai* technique—a hallmark of Kanjeevaram craftsmanship. Despite its fame, the town of Kanchipuram does not produce silk or zari. Instead, it thrives as a weaving hub, with skilled artisans from neighboring towns like Salem, Arani, Coimbatore, and Kumbakonam contributing to its legacy.

Please see at the end of the write up for additional facts.

A Legacy Woven Through Time

Kanjeevaram sarees were once considered offerings to the gods. Their origins trace back to Sage Markanda, the legendary divine weaver. Initially woven as nine-yard creations, they were later adapted to six yards for broader appeal and practicality.



The art of silk weaving in Kanchipuram flourished under the Pallava dynasty (7th–9th CE), and later under the Chola dynasty, King Raja Raja Cholan (985–1014 CE) invited skilled weavers from Saurashtra to elevate the craft. The Vijayanagara Empire (1336 – 1646 CE) further enriched the tradition, with communities like the Devangas and Saligars migrating from Andhra Pradesh.

Until India's independence in 1947, the Kanjeevaram weavers faced exploitation. In 1949, the Kamatchi Amman Society - the first cooperative - was formed with 79 weavers. Today, 24 government-managed cooperatives support over 50,000 weavers. To combat child labor, the Tamil Nadu government introduced mechanized equipment to replace helper roles. Despite modernization and shifting consumer preferences, the Kanjeevaram silk industry continues to thrive.

Six Yards of Love and Legacy

Feature	Details
Origin	Kanchipuram, Tamil Nadu
Materials	Mulberry silk (Karnataka), Zari (Surat)
Technique	Korvai (interlocking borders and pallus)
Time to weave	3–4 weeks per saree
Recognition	GI tag by Government of India (2005–2006)
Industry Size	~50,000 weavers, ₹200+ crore turnover (USD \$22M)



Next time you drape your Kanjeevaram saree, pause for a moment. Feel the love, creativity, and craftsmanship woven into its threads. Sense the history behind it. Remember the warmth of your Ma, Dimma, or Thamma. And know that through this six-yard swath, you carry forward a legacy - one that can be passed on to the next generation.

Research Sources: Various online resources

Photo credit of Ma's saree: Anjana Balachandar



MA DURGA HAS A SMARTPHONE

Samrita Roy - Age 9

Guess what, Ma Durga downloaded Instagram on her new Google Pixel 9. She loves this brand new tech. That isn't there in her world. She's still figuring out how to use it, but she's having tons of fun! When I opened Instagram the next day she posted so much in one day! Here are some of the things she posts.

She posted a picture of her. And one picture of her and her kids, Lakshmi, Sarawati, Ganesh, and Kartikeya. She also posted one of her husband, Lord Shiva. And she posts one with the entire family. And she also showed her world and how it is like. And she decided to follow me and my mom and dad!

She even wrote a story on how she defeated Mahishaura. And one story about her life. And in her 5 days of visiting she posted a reel of her playing with sindoor. And one reel of her eating sweets. She also sees the news all the time. Here's why.

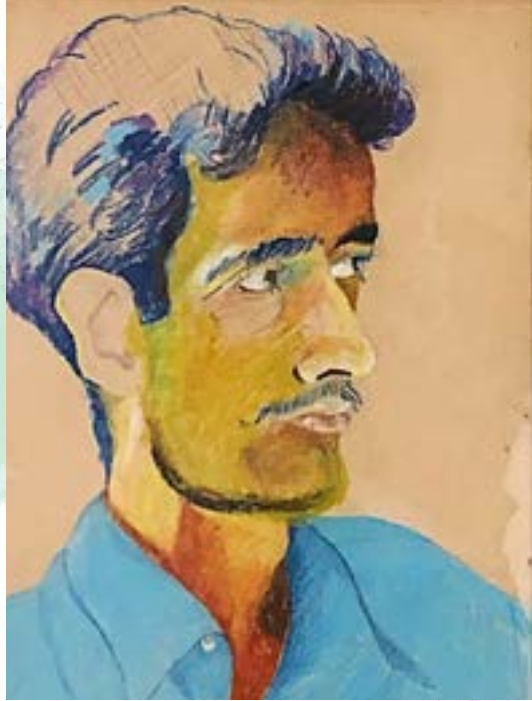
Whenever there is trouble she uses her GPS to go there and help. She also downloaded Whatsapp. To text her brother, Vishnu. Ma Durga LOVES her smartphone. And is having a ton of fun.

ছবি আঁকার মানুষরা

রাহুল রায়

আমি ছোটবেলা থেকেই আঁকা-আঁকি করি। তখন রং-তুলি, ভাল আঁকার কাগজ এসব কেনার পয়সা কোথায়? তাই বাড়িতে এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো ইত্যাদি বড় বড় শিল্পির শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্কেচ আর ব্রজ রায়চৌধুরীর দুই খণ্ডে স্কেচ করার বই দেখে দেখে আমার স্কেচ করতে শেখা। তবে মুখের ছবি বা পোরট্রেট আঁকা ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। কারণ বামেলা কম নয়। সেলফ-পোরট্রেট-এর জন্য একদম একই ভঙ্গিতে বসে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত চালিয়ে যেতে হবে। তখন তো ফোটোগ্রাফ এত সহজে পাওয়া যেত না। তাই এই উপায়। তার চেয়ে অনেক সোজা সামনে কাউকে বসিয়ে আঁকা। কিন্তু কাকে বসাই? ঘণ্টাখানেক একভাবে বসে থাকা কি সহজ কথা? তাই কেউ রাজি হয় না। সবাই 'এখন না, পরে' বলে কেটে পড়ে।

একমাত্র টাকুদা, মানে আমার মেজ পিসিমার ছোট ছেলে একবার সিটিং দিতে রাজী হয়েছিল। তাও অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর। আমি সেই পোরট্রেট পেপিলে একে অনেক বছর পর প্যাস্টেল রং দিয়েছি। এই ছবিতে টাকুদার মুখ, বিশেষ করে ওর মুখের 'চরিত্র' খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। এই চরিত্র ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা বেশ মুশকিল। খালি উদাহরণ হিসাবে এইটুকু বলতে পারি কারো মুখের 'চরিত্র' স্বাভাবিকভাবেই কমনীয়, কেউ রুক্ষ, কারো খুব আন্তরিক, আবার কারো 'দুরে সরে থাকা' বা 'ডিসট্যান্ট'। আবার কারো মুখের চরিত্র 'কঠোর', যাইহোক, টাকুদার এই ছবিটা একে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। ওর মুখের চরিত্র একেবারে ফুটে উঠেছে।

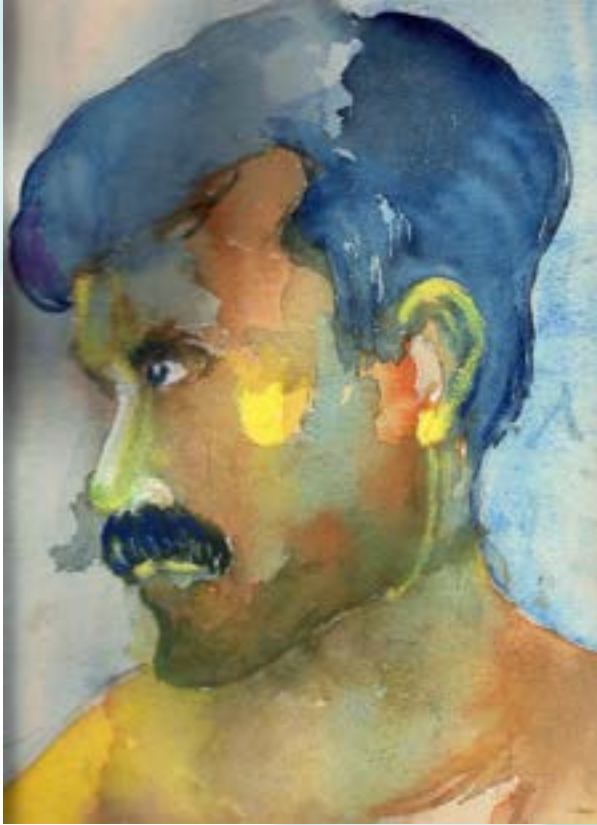


২০১৭ সালে কলকাতায় বেড়াতে গেছি। সেখানে আমার এক পিসতুতো বোনের ছেলের জন্মদিনে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখি সেখানে আমার আর সব পিসতুতো ভাই-বোনেরাও হাজির। বহুদিন বাদে টাকুদার সঙ্গে আবার দেখা। বহু বছর আগে আমি প্যাস্টেল রঙে টাকুদার যে পোরট্রেট আঁকেছিলাম সেই ছবিটার প্রতিচ্ছবি আমার সেল ফোনের অ্যালবামে ছিল। টাকুদা সে ছবি দেখে তো অবাক। ছোট বয়সের নিজেকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। এখন তার মাথা- ভর্তি টাক। খালি দেখে, আর বলে – “খোকন, তখন আমার মাথায় এতো চুল ছিল!”

ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় আমি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ আঁকা শিখতে ঢুকলাম। এটা কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পাওয়ার ব্যাপার নয়। নেহাতই ছবি আঁকার নানান টেকনিক শেখা। খুব হাসিখুশি, ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সমরেশদা ছিলেন আমাদের শিক্ষক। মাঝে মাঝে এসে প্রায় হাতে ধরেই আমাদের দেখিয়ে দিতেন।



একদিন তিনি এসে বললেন পরের সপ্তাহে 'লাইভ মডেল' আসবে। আমাদের কী উৎসাহ। মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনাও ছিল। কোন কারণে আমাদের মনে হয়েছিলো 'ন্যুড স্টাডি' করতে হবে। সুতরাং উত্তেজনাটা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। প্রথমদিন এল একটি মেয়ে। তবে আমাদের চাপা উত্তেজনার মুখে ছাই দিয়ে শাড়ি-ব্লাউস পরা। সে আমাদের সামনে একটা উঁচু পাটাতনে বসে রইল, আর আমাদের তাকে দেখে আঁকতে হল। তার পেঙ্গিল স্কেচ এখনো আমার কাছে আছে। তার পরের সপ্তাহে জাগিয়া পরা এক গুঁফো লোক। একে আমি ঐঁকেছিলাম প্রধানতঃ জল রঙে।



সবচেয়ে মজার কথা অনেক-অনেক বছর বাদে আমাদের বন্ধু, কলকাতা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আর্টিস্ট ও ভাস্কর প্রবাল বসু আমাদের বাড়ির দেওয়ালে সেই লোকটির পোরট্রেট দেখে বলে –“আরে একে তুই চিনলি কী করে? এতো আমাদের সিটিং দিত!” আসলে তখন কলকাতায় সিটিং দেওয়ার জন্য হয়তো একজনই ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল এতো বছর পর এই লোকটির পোরট্রেট আমাদের দুজনের কতো পুরনো দিনের স্মৃতি সামনে এনে দিল।

এইসব নানান গল্প আমার আঁকার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।



সূর্যাস্তে সূর্যোদয়

- নৈত্রেরী মেন

বন্দনার দু কাপ কফি শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু এখনও দমদম থেকে দিল্লির ফ্লাইট কখন ছাড়বে তার কোনো ঘোষণা নেই। শুধুই দেখাচ্ছে ডিলেড। যথারীতি শ্যামা চরণ ব্যানার্জি পাইপ মুখে দিয়ে পায়চারী করছেন আর সিভিল এভিয়েশনের বাপান্ত করছেন। আর যখন প্রেসারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে বউয়ের উপর চোটপাট করছেন, আমি বারবার বলেছিলাম এই সময় কাশ্মীর যাব না অক্টোবরের পর যাব। তোমার জন্য আমার এই দুরবস্থা। বন্দনা তো ভেবেই পাছেন না তার অপরাধটা কোথায়। যথারীতি শ্যামাচরণের ইচ্ছাতেই কাশ্মীর যাওয়া, তিনি সময় ঠিক করেছেন, তবে বন্দনা জানেন মেয়েমানুষ মানেই শুধু শুনে যেতে হয়। দু'ঘণ্টা লেট করে প্লেন ছাড়ল। দিল্লি থেকে এবার ঠিকানা শ্রীনগর। শ্রীনগর থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে গুলমার্গ। গুলমার্গ মানে ফুলের পথ। সমস্ত পথটা তুষারে তুষারে ঘেরা, ফার আর দেওদারে ছাওয়া গুলমার্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ সুন্দর। ৮৬৯৪ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত গুলমার্গ শীতকালে শুধুই বরফ সাদা। প্লেন লেট হওয়াতে শ্যামাচরণ বাবুর মাথা ধরে গিয়েছে, তিনি হাওড়া জেলা শহরের ব্যস্ত ডাক্তার, তার উপর আবার শিশু চিকিৎসক। দু মাস আগে নাম লেখালে তবে তার এপোয়ন্টমেন্ট পাওয়া যায়। তার কথা সিভিল এভিয়েশন একবার ভাবল না। এ কী অন্যায়। শ্রীনগর প্লেন থেকে নেমে হোটেল যাওয়া পর্যন্ত বন্দনা কাঁটা হয়ে থাকে, আবার তার কী অপরাধ হয়ে যায়।

কর্তার হুকুম পরের দিন সকালে গণ্ডলা বা রোপওয়াতে চড়ে কংডোরি প্রথা ধাপের পরের ধাপে আফটারওয়াট পর্যন্ত দেখতে হবে। আফটারওয়াটের ১৩৭৮৮ ফুট উচ্চতায় চারপাশের নৈস্বর্গিক দৃশ্য অসাধারণ। আফটারওয়াট থেকে হেঁটে দু কিলোমিটার দূরে আলপাথার লেক দেখে আসতে হবে। বন্দনার বুক টিপটিপ করে, হাঁটুতে যা ব্যথা দু কিমি হাঁটতে পারবে তো? তার উপর শ্যামাচরণ বাবুর ইচ্ছে শিশু উদ্যান, গল্ফ ক্লাব, মহারাজা প্যালেসের ভগ্নাবশেষ, স্ট্রবেরি ভ্যালি, রামমন্দির, সুফিসাধক বাবা রেসির মাজার প্রভৃতি দেখতে হবে। স্বামীর এই আদেশ শুনে বন্দনা ঠাকুরকে একমনে ডাকতে থাকে, কাল যেন সব জায়গাগুলো ঘুরতে পারি। ঠাকুরের নাম করে বন্দনা স্বামীর সাথে শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের দূরত্ব ছাপান্ন কিমি। আড়াই ঘণ্টা পরে গুলমার্গে যখন পৌছান তখন-ই বন্দনার পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। এইবার গন্ডোলা চড়ে কংডোরি। বন্দনা এবার মুগ্ধ হয় চারিদিকে শুধু বরফ বরফ, তার মধ্যে কেউ স্কি করছে, কেউ বা স্লেজ গাড়ি করে বরফের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ স্নো-বাইকিং করছে। বন্দনা এই প্রাকৃতিক পরিবেশে ঈশ্বরের এই অপরিপূর্ণ রূপের কাছে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে পায়ের ব্যথা, শরীরের অসহযোগিতার কথা ভুলে দৌড় শুরু করতে গিয়ে হেঁচট খেয়ে বরফের উপর গড়িয়ে পড়ে গেলো।

শ্যামাবাবু তখন স্নো-স্লেজের গাড়ির লোকেদের সাথে দরাদরি করছিলেন। বন্দনাকে পরে যেতে দেখে রোষ কষায়িত দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করতে করতে তুলে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ষাটোর্ধ বয়সী শ্যামাচরণ বাবু বন্দনাকে কিছুতেই তুলতে পারছেন না। তাই দেখে আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে গেলো, অতি কষ্টে বন্দনাকে ধরে বসালো। বন্দনার পায়ে যদিও বেশি লাগেনি, কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়ের কথা ভেবে সে কাঁটা হয়ে থাকল।



এই সময় যারা বন্দনাকে ধরে তুলেছিল তাদের মধ্যে এক বয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ বন্দনার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বনু না? বন্দনা চমকে উঠল, সুবিমলদা! তাদের গড়পাড়ের বাড়িতে তার দাদার বন্ধু সুবিমল সেনের ছিল অগাধ যাওয়া আসা। তার দাদা অনিমেঘ আর সুবিমল ছিল হরিহর আত্মা। তারা দুজনেই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বন্দনা বুঝত তার প্রতি সুবিমলের একটা দুর্বলতা ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, ভালো গান করে, নিজের বিশ্বাসের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষটাকে পছন্দ না করে কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সুবিমলরা ছিল নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত। তাই নকশাল আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ যখন টালমাটাল তখন সুবিমলের বাবা মা ওকে কোনোরকমে ওর বড় কাকার কাছে পাঠিয়ে দেয় হায়দ্রাবাদ। তারপরের খবর অবশ্য বন্দনা আর জানে না। আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার সুবিমলের সাথে দেখা।

শ্যামাচরণ বাবুর ঙ্গ কুঁচকে উঠল, কী ব্যাপার এ আবার কে। বন্দনা উত্তর দিতে গিয়ে কর্তার দিকে একবার তাকিয়ে বললো, সুবিমলদা আপনি? সুবিমল বলল, বনি তোকে তো চিনতেই পারিনি। এই বুঝি তোর কর্তা? শ্যামাচরণ বাবু দায়সারাভাবে নমস্কার করলেন, বন্দনা পরিচয় করিয়ে দেবার পর। সুবিমল পরিস্থিতি বুঝে বলল, তোরা কথায় উঠেছিস, কদিন আছিস? বন্দনা তাড়াতাড়ি হোটেলের নাম বলে বলল, আরও চারদিন আছি পারলে তুমি একবার এসো। শ্যামাচরণ বাবু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বউয়ের দিকে তাকালেন। সুবিমলকে কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বন্দনার হাত ধরে ফিরে যাবার জন্য শ্যামাচরণ এগোলেন। পরের দিন বন্দনার হাঁটু ফুলে ঢোল, কিন্তু সে জন্য শ্যামাচরণ বাবুর সোনমার্গ যাওয়া তো আর থেমে থাকতে পারে না। তিনি সকাল ন'টার সময় তার নির্ধারিত গাড়িতে সোনমার্গের পথ ধরলেন।



বন্দনা হোটেলের বিছানায় যন্ত্রণার ওষুধ খেয়ে তার বিবাহ পরবর্তী জীবনের কথা ভাবতে লাগল। রামকৃষ্ণ মিশন, তারপর মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা অত্যন্ত মেধাবী শ্যামাচরণ বাবুর সাথে তার রূপের জোরে বিয়ে হয়ে ছিল। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট বিয়ের সাতদিন পর থেকেই অষ্টমঙ্গলায় তার বাপের বাড়ি যাওয়া থেকে শুরু হয়ে যায়ে শ্যামাচরণ বাবুর বউয়ের অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। কে পড়াত, পাড়ায় কে কে বন্ধু ছিল, মেয়ে বন্ধু ছাড়া আর কেউ বন্ধু ছিল কিনা ইত্যাদি।

হোটেলের এ সি ঘরে আরামে শুয়ে থাকতে থাকতে তিনি ভাবছিলেন হাওড়ার বাড়িতে তিনি কোনওদিন এ সি ঘরে শোওয়ার প্রবেশাধিকার পাননি। তিনি একতলায় থাকেন শাশুড়ির পাশের ঘরে। আর শ্যামাচরণবাবু দোতলায় এ সি লাগানো ঘরে। কর্তার প্রয়োজনে তিনি নেমে আসেন। বন্দনার ওপর ঘরে শোওয়ার অধিকার নেই।

শ্যামাচরণ বাবুর বিশ্বাস এত সুন্দরী মেয়ে অথচ তার কোনো পুরুষবন্ধু ছিল না, এ হয় নাকি। ইদানীং কালে তার স্কুলের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর তাদের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, ও নাকি বিয়ের আগে কার সঙ্গে কোথায় পালিয়েছিল। এইসব কথার প্রতিবাদ করারও সাহস পান না তিনি। তার বাপের বাড়ির জোর নেই, মা-বাবা কবেই মারা গেছেন, দাদার অবস্থাও ভালো নয়। কী করে মুক্তি, কবে মুক্তি ভাবতে ভাবতে হোটেলের দরজায় বেল।

দরজা খুলে দেখে, সুবিমলদা। ও আনন্দে কথা হারিয়ে ফেলে, তার খোঁজ নেবার জন্য এখনও একজন আছে এই পৃথিবীতে। সুবিমলদা বলেন আমি জানি তুই আজ বেরোতে পারবি না, আর তোর বর তোকে সাহচর্য দেবার জন্য এখানে থাকবে না - তাই কেমন আছিস জানতে এলাম। এরপর সুবিমলদা বলেন কাকার কাছে থেকে বোটানি নিয়ে বি এস সি, এম এস সি পাশ করে। তারপর ফরেস্ট অফিসারের চাকরি নিয়ে পুরুলিয়ার বন্দোয়ানে চলে যান। ওখানে তিরিশ বছর চাকরি করে ভালোপাহাড় বলে পুরুলিয়ার একটা জায়গায় অনাথ শিশুদের জন্য একটা আশ্রম খুলেছেন। তার প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা দিয়ে। ওখানের লোকেরা ভীষণ গরিব, বাচ্চাগুলোকে পড়াতে পারে না, খেতে দিতে পারেনা। তাই ওদের দেখাশোনা করেই তাঁর জীবনটা কেটে যাচ্ছে। ওরাই ওঁর আপন, জীবনে আর আপন বলে তেমন কেউ নেই। এরপর বন্দনা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। তার এই পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনের কথা শোনায়। সুবিমল স্তব্ধ, বলেন পুরো জীবনটা নষ্ট করে ফেললি, আর যে ক'বছর বাঁচবি মানুষের মতো বাঁচ। পুরুলিয়া এসে ওই অনাথ বাচ্চাগুলোর মা হয়ে দেখ জীবনকে কতভাবে সফল করা যায়। যেখানে তুই অপ্রয়োজনীয় সেখানে শুধু সমাজ আর মেয়েদের কথা ভেবে নিজেকে নিঃশেষ করে দিবি?



কাল সকাল এগারোটা-তে আমি আসবো, আমার সাথে চল, মেয়েদের আর শ্যামাচরণ বাবুকে চিঠি লিখে চল। যদি রাজি থাকিস তো কাল সকাল এগারটায় শ্যামাচরণ বাবু বেড়াতে বেরিয়ে গেলে এসে তোকে নিয়ে যাব।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, বন্দনা দেবী তার স্বামীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন তিনি পুরুলিয়ার বন্দোয়ানে যাচ্ছেন, জীবনের শেষ ক'টা বছর - যেটুকু সময় ঈশ্বর তার জন্য বরাদ্দ করে রেখেছেন সেই সময়টা তিনি মানুষের কাজে উৎসর্গ করবেন। যেখানে কেউ তার মনিব নয়, কেউ তার জীবনে ঠিকাদারির হিসাব করবে না, শুধু গরিব অনাথ কিছু শিশু, প্রকৃতির অপার করুণা আর অসহায় মানুষের ভালোবাসা থাকবে। মেয়েদের দুজনকে ফ্লোরিডা আর ব্যাঙ্গালোর জানিয়ে দেবেন এত বছর পর তাদের মা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল। নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিলো। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্রে মুনাল যেমন বলতে পেরেছিল, আজ আমার সামনে অনন্ত সমুদ্র, মাথার ওপর সীমাহীন নীল, চারপাশে সবুজের সমারোহ যেখানে আমি কারুর বউ নই, কারুর বাপ মা হারা মেয়ে নই, কারুর তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নই। শুধুই আমার মালিক। আমি আর আমার জীবন দেবতার পায়ে সমর্পন করার পূজোর ফুল।

একটা ছোটো অভিজ্ঞতা বাবীয়া চন্দ

সেটা ছিল ১৯৭৩ সাল। ইন্টারভিউ এর চিঠি পেলাম ডাকযোগে। তখন আমি আসাম, আমার তেজপুরের বাড়িতে। পড়াশুনো করে চাকরির চেষ্টায় আবেদন করে চলেছি। তারই ফল ইন্টারভিউ চিঠি প্রাপ্তি।

বলে রাখা ভালো যে বাবা ব্রিটিশ কোম্পানি (Jardin and Anderson) পরিচালিত আসামে চা-বাগানে অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে কর্মরত ছিলেন। তখন আমাদের ছোটবেলায় (১৯৬০ সাল) ঐ চা-বাগানে অসমীয়া ভাষায় পড়াশুনো ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কোলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো শুরু ও শেষ।

এবার ইন্টারভিউয়ের কথায় আসি। দুটো চিঠি এসেছে পর পর দুদিনের তারিখে - একটা আসামের তেজপুর গার্লস হাইস্কুল আরেকটা কলকাতার কাছে সোদপুরে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লস। এখানেই সমস্যা। ঠিক হল প্রথম দিন তেজপুরে ইন্টারভিউ দিয়ে বিকেলের ফ্লাইটে এক ঘন্টায় সন্ধ্যাবেলা দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলে পরেরদিন সোদপুর স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে পারবো। দুই রাজ্যের দূরত্ব তো কম নয়। যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে সকালে তেজপুর স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়ে বুঝলাম আমার এ চাকরি হবে না। কারণ কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করে বড় হয়েছি, অসমীয়া ভাষায় পড়ানোর মতো বলায় স্বচ্ছন্দ নই। এবার গন্তব্য তেজপুর এয়ারপোর্ট, বেশ ছোটো। বাবা এয়ার টিকেট দিলেন আমার হাতে। আমার কাছে একটা চামড়ার মাঝারি সুটকেস আর কাঁধে ব্যাগ। বিদায় জানিয়ে আমিও বাবাকে প্রণাম করে এগিয়ে গেলাম। বাবা ফিরে গেলেন। প্লেন ছাড়তে তখন দু ঘন্টা বাকি, বসে আছি। বিকেল পেরিয়েছে। এমন সময় ঘোষণা শুনলাম 'ভাইকাউন্ট নম্বর...' আজকের জন্যে বাতিল! এত অসহায় কখনো লাগেনি। তখন মোবাইলের আগমন ঘটে নি। কিভাবে বাড়িতে খবর দেবো, কিভাবে ফিরে যাবো জানি না। চাকরিটাও খুব দরকার।

অনেক ভেবে এয়ারপোর্টের অফিসে গিয়ে আমার সমস্যার কথা জানালাম। সব শুনে যা জানলাম তা হলো আধ ঘন্টা পরে একটা ফ্লাইট আছে যেটাতে চায়ের পাতার বড় বড় বাক্স আনা - পাঠানোর কাজ হয়। সেই ফ্লাইটের পাইলটকে যদি রাজি করতে পারি তাহলে যাওয়া হতে পারে। দেখা যাক।

কিছু পরে প্লেনটা মাটিতে নামার সাথে সাথে পাইলটকে নামতে দেখে শুধু ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা নিয়ে এক দৌড়ে পৌঁছে গেছি তার কাছে। হাত জোড় করে বলতে শুরু করেছি আমার ওজন মাত্র ৩৫ কেজি, কাজটা খুব দরকার, মালবাহী প্লেনে কোনো অসুবিধে নেই, বসার জায়গা দরকার নেই। চায়ের বাক্সের উপর বসে চলে যেতে পারবো। এক নিঃস্বাসে বলে চলেছি, হাঁপিয়ে গেছি উত্তজনায়া। পাইলট একটি শর্ত দিয়ে রাজি হলেন। শর্ত হলো আমার বৈধ টিকেটটা দমদম এয়ারপোর্টে যেন না দেখায়। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম যে হ্যাঁ পারবো। তখন আমি সাহসী আর স্মার্ট শব্দটাও শুনতে পেলাম। আবার এক দৌড়ে ব্যাগ আর সুটকেসটা নিয়ে এলাম। অফিস এ জানিয়ে এলাম।

প্লেনে উঠে দেখি চায়ের পাতা ভর্তি বাক্স অনেক অনেক। একটা কোনে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। প্লেন ছাড়লো, উড়তেও শুরু করলো। এক ঘন্টার মতো যাত্রার সময়। মিনিট কুড়ি পরে আমার বসার ব্যবস্থা হলো।

সন্ধ্যে সাতটায় দমদমে নামলাম। কিন্তু এরকম প্লেনে আসবো আমার অভিভাবকেরা জানেন না। দমদমে নির্দিষ্ট প্লেন বাতিল শুনে তারা ফিরে গেছেন। তাই কেউ নেই আমাকে রিসিড করার জন্যে। টিকেটের শর্তের কথা মনে আছে। কার্গোর দিকে বেরোনোর চিন্তা করতে করতেই কয়েকজন লোক একসঙ্গে যাচ্ছেন দেখে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। টিকেট পরম যত্নে রাখা ব্যাগ এর মধ্যেই রয়ে গেলো।

এতসবের পরেও আরো কিছু বাকি ছিল। বাইরে বেরিয়ে না বুঝেই বাস যাচ্ছে দেখে উঠে পড়েছি। দমদম থেকে আমার গন্তব্যস্থল সোদপুর খুব দূর নয়। উল্টোদিকের বাস এ চড়ে চলে এসেছি মহাত্মা গান্ধী রোডে - এয়ার অফিসে। হতভম্ব অবস্থা - কি করবো ? অগত্যা অফিস এ গিয়ে জানলাম রিকশায় শিয়ালদহ পৌঁছে মেন লাইনের ট্রেনে সোদপুর রেলস্টেশন। কলকাতায় তখন হাতে টানা রিকশা, হর্নের ব্যবস্থা বড় একটা ঘুঙুর। টুংটাং শব্দ করে সে রিকশা চলে। চড়ে বসলাম সেরকম একটায়। বড় রাস্তা এড়িয়ে, আলোয় ভরা পথ এড়িয়ে প্রায় অন্ধকার অলিগলির সরু সরু পথ ধরে। দমবন্ধ অবস্থা। কিছু পরেই আলোয় আলো বেশ বড় করে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম দেখতে পেয়ে স্বস্তি পেলাম। তখন বুঝলাম কলকাতার চলমান গাড়ির রাস্তায় টানা রিকশা চালানো খুব সুবিধের নয়। তারপর ট্রেনের টিকেট কেটে রাত দশটায় নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোলাম। আমাকে দেখে তো সবাই অবাক।

পরের দিন সকালে ইন্টারভিউ দিলাম আর তারও কয়েকদিন পরে চাকরির যোগ্যতার চিঠি পেয়ে সেখানে যোগ দিলাম।



Owl Art of Bengal

- Rajarshi



বাংলার প্রাচীন সামাজিক, সাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে পেঁচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৮৬২-তে কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতুম পেঁচারের নকশা” বইটি বাংলা সাহিত্যে আজও বিশিষ্ট মর্যাদার জায়গায় আছে। পূর্ব বর্ধমানের নতুন গ্রামে আঞ্চলিক কাঠের তৈরি বিভিন্ন ছোটো-বড় আকৃতির রঙিন জোড়া পেঁচা শতাব্দী প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি বাড়ির মঙ্গলমূর্তি রূপে গৃহে স্থান পেয়ে আসছে। সম্পদ ও মঙ্গলের দেবী লক্ষ্মীর বাহন রূপে পেঁচা পূজিত হয়। বাংলাদেশের কয়েক দশকের মঙ্গল শোভাযাত্রায় পেঁচার মূর্তি একটি প্রধান প্রদর্শন শিল্পবস্তু হয়ে উঠেছে, যা খুবই জনপ্রিয়।



পেঁচা মূলত নিশাচর প্রাণী, দিনে এরা ভালোভাবে দেখতে পায় না। শহর অঞ্চলে পুরোনো বাড়ির বড় বড় ঘুলঘুলিতে এদের পছন্দের বাসস্থান ছিল। কিন্তু নগরায়নের চাপে সেই বাড়িগুলি হারিয়ে যাওয়ায় এদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। শহরে বা মফস্বলে আজ আর পেঁচা খুব কমই চোখে পড়ে। জীবিত পেঁচা এবং দারুশিল্পের রঙিন পেঁচা - দুটোই আজ বিপন্ন। তাই দীর্ঘদিন ধরে আমি পেঁচার নানান ছবি এঁকে যাচ্ছি মানুষকে সচেতন করতে। আমার সীমিত সামর্থ্যে এ এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

HAPPY SUNSHINE

Srijita Dutta

When the sun shines
Yes it does remind
That out of love it can
be both strong and kind.
When the rain falls
on the parched soil
It reminds don't you think
of love to those who toil.
When the flower bud
pushes forth and blooms
Don't you think it says
forget all your glooms.

When the birds leave their nest
and fly oh so high
they sure remind
that eternal love we can never deny.
When i close my eyes
and think of god's grace,
nature showers upon me
love that i embrace.
The light rays, the sudden showers
and the flowering stem.
The birds make me feel
that we can spread love just like them!

ছোটদের প্রবাসী

সুহাস বড়ুয়া

আমাদের প্রবাসী,
যেন ছোট বাংলা,
বাংলায় কথা বলি,
নেই তাতে ঝামেলা;
নাচ করি, গান করি,
ছড়া ও কবিতায়,
পুজোর ঐ দিনগুলো,
খুশিতেই কেটে যায়।
রসে ভরা মিষ্টি,
জিলাপী ও সন্দেশ,
আতা, কলা, আম, জাম,
হয় নাতো খেয়ে শেষ।



রকমারী খাদ্য,
চিড়া মুড়ি, খই, দই;
ঢাক ঢোল বাদ্য,
চারিদিকে হই চই।
আমাদের চেতনায়,
কবিগুরু, নজরুল!
সাহিত্য - সঙ্গীতে,
অপূর্ব দুটি ফুল।
প্রবাসের প্রবাসী,
গড়ে উঠা বাংলা,
প্রজন্ম হৃদয়ে,
বাস্তব দেয় দোলা।

SOPHIE'S BEAUTIFUL WORLD

Maitreyi Sophie Sen - Grade 7

Let's change the world by
We can change the world by
Let's change the world by
We can light up the world by
I will brighten the world by showing
We can help the world by
By Humming and shimmering we will
We can make the world more fun by
We can make the world more caring by
We can make the world more nice by
I will happily help the world by

Cheer cheer cheer let's change the world

Reusing and recycling
Ending Covid
Finding peace
Listening and love
Empathy for animals
Caring for old people
Tell the truth
Imagining more
Opening doors for people who need it
Not fighting
Staying calm



LAUGHING THROUGH LOCKDOWN

Kaushiki Banerjee - Grade 11

Loneliness sat beside me,
Uninvited, but always there,
Quarantine made us best friends,
The oddest pair.
Parties? What are those?
My invites must've got lost,
A mailbox in the Bermuda Triangle,
Friendship at a cost.
Silence reigned supreme,
Except for parental chatter,
Their voices my only soundtrack,
Doesn't get much flatter.
Zoom calls with the mirror,
It never missed a date,
Dinner with my dog,
Culinary fate.

Netflix and chill? Sure,
With a mountain of snacks,
The remote my companion,
Pajamas never slack.
Tried baking bread once,
It rose, then collapsed,
A doughy metaphor for my social life,
Quite a laugh, perhaps.
Finally, emerged a butterfly,
Or maybe a hermit crab,
Ready to socialize,
Or maybe just take a nap.
Loneliness and I parted ways,
But what a quirky time,
Quarantine chronicles,
A saga so sublime.





I AM FROM

Maitreyi Sophie Sen - Grade 7

I am from the freezing winters of Wisconsin.

I am from fuzzy nights with Buzz.

I am from Gavin giving me piggybacks, I am from Yasmine's and my crazy playdates.

I am from the Sunday specials of luchi and mutton, I am from sweet juicy Rasogolla.

I am from the childhood games with my mom, I am from the airplane and restaurant games.

I am from the classic Indian dinner of rice dal veggies and a nonveg.

I am from the Nuts 4 Nuts stores in NYC.

I am from the delicious Finnish salmon and dal makhani for achievements.

I am from the "think smart not hard" quote.

I am from "kata kuti is a very powerful tool".

I am from playing a biggillon game with Mamu.

I am from the sizzling barbecues every once in a while, I am from the rainy-day khichuri dinners.

I am from the sunny but sticky days in Connecticut.

I am from the fashionista Sonia Mashi.

I am from the one time Rasogolla Mamu gave me baked Rasogolla.

I am from the delicious fish made by Boro Didun and Papai.

I am from the crazy fun games with Buzz, I am from the rustling under the tree on Christmas night.

I am from the playing colors on Holi, I am from lighting sparkles on Diwali.

I am from the fun sleepovers with my friends.

I am from the 8 hour car drive to Toronto.

I am from the annual Bruce camping trips.

I am from a 3 month European trip, I am from the 2 month long India trip.

I am from my parents - friends - and family

I am from things that never will end.



A day spent with Ma Durga in Boston

Adhrit Mukherjee, Grade 2

When I woke up I saw Maa Durga but I couldn't believe my eyes but she said I want a tour of Boston. I was very excited, and I wanted to show her all my favorite places in Boston. First I took her to see the Boston Celtics stadium she was happy to see Jasen Tatum play. Then I took her to see the Red Sox game. After that she got tired, and I took her to a relaxing whale watching. After that Maa Durga said she wanted to go home because she was missing her children. Then I told her you were missing the best part. Maa Durga asked what it was. So I took her to Castel Island Beach. She was amazed to see sunset and thought it was better than heaven. After that she returned home and was happy to see her children and told them about her beautiful day in Boston. I was very happy since I spent my time with Maa Durga doing all the fun stuff!!!

Aishani Ghosal, Grade 4

Last Saturday was the best day ever! I went to Durga Puja at Prabasi with my family, and guess what? I got to spend a whole day with Ma Durga and her family- for real! Maybe I was dreaming, but it felt super real! As we entered the big hall where the Puja was happening, everything looked magical- like Disney castle! There were sparkling lights, music, flowers, and everyone was dressed in beautiful, colorful clothes just like Disney royalty. At the center of it all stood Ma Durga, tall and graceful, with her pet lion and her children - Ganesha, Lakshmi, Saraswati, and Kartikeya- standing beside her. They looked like powerful fairies straight out of a storybook. To me, Lakshmi looked exactly like Princess Aurora, and Saraswati reminded me of Cinderella. During the prayer, my mom gave me some flowers to offer. I closed my eyes, made a wish, and when I opened them - Ma Durga was still on stage, but this time, she was looking right at me! Then something unbelievable happened. She smiled and stepped off the stage, followed by her children. I felt a little nervous, but Ma Durga gently said, "Don't be afraid, little one. Let's have some fun today! Would you mind giving us a tour of Boston?"

How could I say no?! I quickly agreed but wondered how they would all fit in our car - especially Ma Durga with her ten arms! Just then, I noticed a beautiful chariot parked outside. It was painted sparkly magenta with butterflies, flowers, and birds shimmering on top. It looked like something straight out of Disney! We all climbed in, and our magical journey began. Our first stop was Boston Commons. Everyone loved the sparkling lake and the colorful garden next to it. Kartikeya ran around so fast he could've won a race, and his peacock danced with joy!

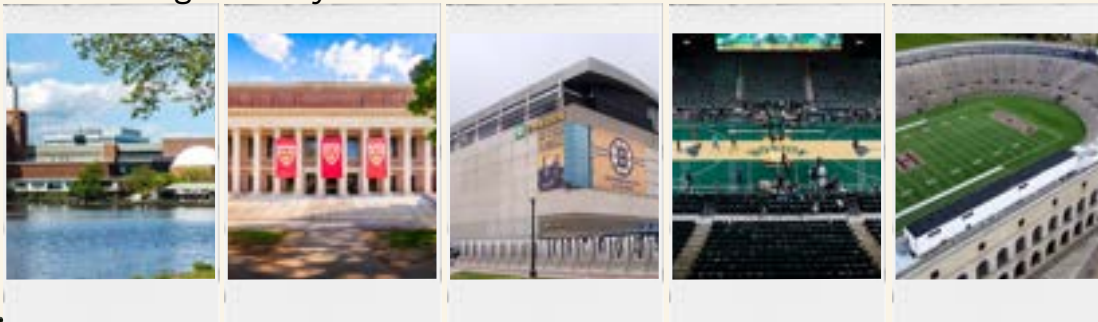
Saraswati's pet swan even got mixed up with the other swans in the lake, but we finally found the right one. Ma Lakshmi explored all the beautiful flowers, and Ma Durga took pictures with her magical phone- how does she manage ten hands at once?



Next, we headed to a bookstore, as I know Saraswati is the goddess of knowledge and wisdom. I showed Ma Saraswati my favorite fantasy books and graphic novels. She smiled and said I was very smart, and I felt so proud! I wanted to take her to the biggest library - Harvard University's but wasn't sure kids were allowed in, so I offered her my Hopkinton town library card instead! Then it was lunchtime. We stopped at a local food truck, and guess who ate the most? Ganesha, of course! He also made us stop at almost every bakery we have passed- he loves sweets just like I do. After lunch, we went on the Charles River duck boat ride. Everyone laughed and had such a good time. I wished they could stay longer, maybe come back in summer so I could take them whale watching or to the science museum.

But it was time to head back. When we returned to the Puja Hall, my mom was looking for me and handed me flower petals and asked me to follow the priest uncle for Pushpanjali. As I looked around, Ma Durga and her family were back on stage, looking just like statues again, but I know they smiled at me.

As she stepped back into her place, Ma Durga whispered in my ear, "Thank you, little girl, for spending the day with us. We'll see you again next year." On the way home, I told my parents everything. They smiled and said I probably imagined it. But I know what I saw - and I can't wait to see them again next year!



Arisha Ghosh, Grade 5

I am very excited to spend time with Maa Durga and her family, showing them the various things they can do in Boston. I would first take them to go on the Boston Duck Tour. The vehicle will take us through the Boston Common, and the tour guide will explain the events that have occurred there in the past, such as military training and rallies. While they are taking us around the city, they show us a Starbucks building in the corner that has a large golden teapot hanging off the side of it, and even small fumes are coming out of it.

I would say the best part of the duck tour that Maa Durga and her family would also like is going on the water. The vehicle transforms into a boat, and like a duck, it can work on both water and land. Maybe Maa Saraswati's pet might even feel like jumping in the water and swimming with it! In the water, everyone can take a turn driving the boat, and Ganesh can even drive the boat with his trunk. Up in the Himalayas, they don't have buses that turn into cars in the waters, so they will have a fun time.

When the tour guide in the vehicle asks everybody where they came from, Maa Lakshmi could tell them about their life in the Himalayas. They would also learn about the different places from which the various people came.



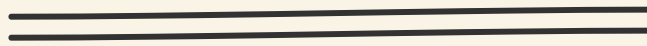
At the end, they would take some professional pictures and take them home to India. We would then visit some local stores and see what decorations or mementos they had that we could purchase to take home. Kartik could get one of the Boston Red socks caps because I think he would like the style on him. Maybe they could even buy some T-shirts that say Boston Bruins, or they could buy a Celtics jersey because they haven't worn one before. After some time, we can go to one of the restaurants along the road and have lunch before heading to the New England Aquarium. They would probably try some American foods, such as some varieties of burgers or sandwiches.

Since I know Ganesh likes sweets, I would suggest he try some flavors of ice cream. When we enter the Aquarium, I would first take them to touch the different baby sharks and sting rays. I feel like they would love to look at the penguin colony and watch all of the

penguins gliding around on ice. Then we would take a look at the Giant Ocean Tank and see many sea turtles swimming around. Then we would go to the gift shop and buy some souvenirs for each of them from the aquarium gift shop, so it would be a little different from what they bought from the streets. They could buy stuffed animals or necklaces featuring little turtles.

Towards the end, we would be feeling exhausted since it had been a long day, so we would go to a restaurant to eat something. I would take them to an Indian restaurant so they can taste a flavor of Indian food made in America. They could eat as much food as they wanted and have any dessert they desired. I can imagine Ganesh getting lots of plates of different types of laddus to fill his tummy up with .

They could all get mango lassi, and while they are drinking, we could take a short walk around the Boston Commons. At night, Boston Common will look different because it may have some sort of lights up, so it will illuminate the entire park. I would show them the carousel, but sadly, it will most likely be closed at that time, so they will not be able to ride it then. We could show them the Frog Pond where people go skating during the winter. Even though nobody was allowed to go in the water, they could try to dip their feet in if they wanted to touch it. We would probably take some pictures in front of the various monuments and read about their history. Even though they probably already learned a lot from the duck tour, it couldn't hurt to just read a little bit more. When we are done walking around, we can go in the car and ride around the city to show them the difference between how it looks during the day and how it looks in the morning. The building lights would be on, so it would give a nice, bright, and comfortable vibe while we drove around and back home.



পুজার রাতে একটা ঐজব ঘটনা

রিয়ানা ব্যানার্জি (Grade 7)

নবমীর রাত। প্যাণ্ডেলে ঢাক বাজছে, আলো ঝলমল করছে। মিতুল এক কোণে লাল ছাতা হাতে এক দাদুকে দেখল। দাদু হাসিমুখে বললেন, - “শেষ ঢাকের তালে মূর্তির পেছনে এক পথ খুলবে... দেখতে চাইলে এসো।” ঢাক থামতেই মূর্তির পেছনে সোনালী আলো ঝলসে উঠল। মিতুল ভেতরে ঢুকল - আকাশে ভাসছে বড় বড় সোনালী পদ্মফুল, কথা বলা কাঠবিড়ালি, ঝকঝকে টাওয়ার। হঠাৎ সামনে দেখা দিল বিশাল এক দুর্গা মূর্তি। তাঁর চারপাশে এক আশ্চর্য দৃশ্য - কার্তিক এক ঝলমলে হোভারবোর্ডে চড়ে আকাশে ঘুরছে, লক্ষ্মী রঙিন ড্রোনে ধান ছড়াচ্ছেন, সরস্বতী ইনস্টাগ্রামে স্ক্রিনে রিল আপলোড করছেন, আর গণেশ ছোট ছোট রোবটদের দিয়ে লাড্ডু তৈরি করছেন।



মা দুর্গা নরম গলায় বললেন, - “তোমার সময় শেষ, ফিরে যাও... কিন্তু মনে রেখো, দুই জগতের দূরত্ব যতটা মনে হয়, ততটা নয়। একদিন তোমাকেই ঠিক করতে হবে কোন জগতকে তুমি নিজের ঘর বলবে।” মিতুল থমকে গিয়ে ভাবল - “এটা কি তবে সত্যিই এক মেটাভার্স? অবতার কাহিনীতে এসব শুনেছি, চোখে দেখা কি সত্যি সম্ভব?” আলো মিলতেই সে আবার প্যাণ্ডেলে দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন কোথাও দূরে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে... অন্য এক জগত থেকে। হঠাৎ চোখ নামিয়ে দেখল - মাটিতে লম্বা এক ছায়া পড়েছে, যেন লাল ছাতা হাতে দাদু ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে... অথচ চারপাশে কেউ নেই। মিতুলের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। সে ধীরে ধীরে প্যাণ্ডেলের ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে গেল... কিন্তু কেউ খেয়াল করল না, তার হাতে ছোঁয়া লেগেছে সোনালী আলোতে ভেজা এক পদ্মফুলের। তাহলে কি... মিতুল আবার মেটাভার্সে ফিরে গেল?



SUMMIT TO SUMMIT IN THE WHITE MOUNTAINS

Ayyan Das (Adi), Grade 8

Our adventure of the “Presidential Hike” began on the night of July 4th, when we prepared for three long days of hiking ahead. We had driven three hours from Massachusetts to hike four mountains in total: Mount Madison, Mount Adams, Mount Jefferson, and finally, Mount Washington. We were in a small room with two bunk beds inside the Highland Center Lodge. The room would be the only one all to ourselves during the entire trip. The plan was to spend the first day hiking up to the first lodge and then, if time allowed, climb Mount Madison. The next day, we would hike Mount Adams, Mount Jefferson, and Mount Washington. The last day would be just to go down and drive home.

After a restless night of sleep, we had breakfast and gathered our things. We had to take a forty-five-minute shuttle to reach the trailhead where we would start. At around 10:00, we arrived at the starting point of our three-day journey. We took out our hiking sticks, set our twenty-five-pound backpacks, and started. The first hour was challenging since I had never hiked with that much weight. However, after a while, I got used to it. On the way up, still, it was a lovely hike, just not as exciting as once we got higher. After many hours and multiple breaks, we arrived at our first lodge, located in the alpine zone. The Madison Hut was pretty small, with the dining hall right at the entrance and the kitchen behind the desk. The beds were bunks of four, and there were many of them throughout the hut’s hallways.

They had to be claimed, so we did so by leaving our stuff on the beds we wanted. The view was the best of the day, as the only trees were less than a couple of feet tall, but they grew wider branches, so they looked like bushes. The trees were an example of how plants adapt to the elevation. The strong gusts break off the tops, which prevents them from growing vertically, so what looks like a small sapling is probably about 200 years old.

Our day was not over, though, as we still wanted to climb Mount Madison. By now, we had already hiked 4.5 miles and gained a total of 4,500 feet. After grabbing a bowl of soup from the lodge, we started our climb of Mount Madison.

Mount Madison was unlike anything we had seen so far because of the rock scrambling and the total absence of plants. It was just boulders. The entire 500 feet we had to climb consisted only of large rocks. Even without our backpacks, it was pretty challenging because of the terrain. Still, it didn't take very long. We were up in about one and a half hours. The view was even better than from the hut. All the other mountains were visible. It was the first time we got to see what lay ahead. It looked far longer than it had sounded when we planned.

We had to make it back down by dinner, which was at 6:00. We barely made it back in time, took off our hiking boots, and sat down at one of the long tables,

each holding about twelve people. For dinner, we had soup, homemade bread, kale salad, turkey, cranberry sauce, peas, mashed potatoes, and a ginger cake for dessert. It was a lot more and a lot better than we expected. They served it family-style, with food in large bowls passed down the table. After dinner, one of the volunteers talked about the adaptations of animals and plants in the alpine zone. Did you know there is a specific type of toad in the alpine zone that survives the winter by freezing solid, then thaws in the spring? The hut had many things to do, like cards, board games, and even a mini library. We played a couple of games of chess while mapping out our hiking route for the next day. We planned to hike over three mountains and arrive at our last hut by six for dinner. We got into our sleeping bags at around 9:30 for what should have been a well-rested night.

We woke up with almost no sleep because of the heat in the small room and the snoring of others. We ate breakfast, got ready, and headed out. Our first mountain of the day would be Mount Adams. We decided to hike around it and then turn back to reach the top, since that route was easier. Even though it was much longer, the view from around Mount Adams was worth it. Off the side of the mountain was a valley with ridges on both sides. Once we got to the other side of the mountain, we set down our bags before hiking to the peak.

The hike to the top was relatively easy and short, but once we reached the summit, it was my favorite view of the entire trip. We were standing on boulders, a lot like Mount Madison, but we were surrounded by multiple mountains and partially in the clouds. Almost half of Mount Washington was mysteriously covered in clouds. Part of Mount Jefferson was also covered. Still, this view was my favorite because of how much there was to see: immense mountains, drifting clouds, and dramatic valleys.

The walk from Mount Adams to Mount Jefferson was a lot of ups and downs and took a while. The view was excellent the whole way, with mountains in front of us and behind, and miles of forest everywhere else. Once we got to Mount Jefferson, it was covered in clouds. The hike up was much smoother than the earlier mountains. There wasn't much of a view on the way up, and none at all at the top. The clouds had gotten so dense at the top that it was hard to see twenty feet ahead. We didn't spend any time up there, since there was nothing to see, and we were way behind on time to finish Mount Washington and reach our hut. We had three hours left and had already been hiking for seven. We were barely halfway.

The walk from Mount Jefferson to Mount Washington was really nice. The clouds had cleared now, so we could see for miles again. This walk had one of my



favorite views because every mountain was visible. There was a lake in the center amidst the forest. We got to the base of Mount Washington and started going up. It had been the easiest part yet; it was smooth and not very steep. It took us about an hour, and once we reached the top, we had finally completed the tallest mountain and hiked all four peaks of the Presidential Traverse. Still, we weren't finished. The top of Mount Washington was a tourist spot, so there was a café and a small museum. We grabbed a snack, since we hadn't had lunch, but didn't have much time, so we left quickly. As we started going down, the wind picked up, and it started to rain. We continued, though, now with gloves and rain jackets. It was rough with a lot of rocks again. Luckily, the rain stopped quickly, so the rocks weren't too slippery. The entire way down, there was flat land with short grass and some patches of flowers and small plants. This was another one of my favorite views. We could see our entire path to the "Lake of the Clouds" hut. It was called that because the hut was surrounded by two lakes, which was unique since it isn't common for lakes to exist 5,000 feet above sea level.

We got back just in time for dinner. It was another very good dinner of more soup, bread, and salad. There were also peas, pasta, and more, with a dessert of applesauce cake. That evening, we got to watch the sunset, and it was beautiful with the outlines of mountains surrounding us, though a little too cloudy. Again we played some chess, mapped out the next day, and went to bed. The next day would just be about getting down and driving home.



The next morning, we had breakfast and got up early for our last day. I had actually gotten a good night's rest and was ready for the ten miles ahead of me. We walked along a ridge for the first couple of hours, and it was another grand view. Mount Washington was behind us, and there were miles upon miles of forest on both sides. We hiked past a couple of small mountains, deciding to skip them, because all we wanted by now was just to get down. Once the trees grew tall enough to block our view, it became pretty boring. Still, in the clearings, there were great views. We could even see the Cog Railway going up to Mount Washington in the distance. Our final reward was a waterfall at the end that we got to swim in. After that, it took us twenty minutes to finally finish the amazing three-day hike. It was my dad's and my most outstanding hiking achievement so far.



Answers

ঠা	কু	র	দা	লা	ন
সিঁ	দু	র	খে	লা	
চা	ল	চি	ত্র		





This summer, I went on a Kenyan safari with my family, grandparents and my cousins, guided all along by two amazing Masai brothers, James and William!

Akashnil Chanda, Grade 9

Before Mara

We spent 2 nights at Amboseli, the home of the African elephants, with beautiful views of Mt. Kilimanjaro. We then spent 2 nights at Lake Elementaita, from where we made day trips to Nakuru to see the rhinos and the endangered Rothschild giraffes, and to Lake Naivasha for a boating safari to see many birds. Finally, we were on our way to the famous Masai Mara! Our goal was to see the Big 5 there, which included lions, elephants, leopards, rhinos, and buffalos. James explained that they are called the Big 5 because they are targeted by hunters but these animals are very strong and can defend themselves.



Tower of Giraffes

Day 1: Arriving in Mara, Game Drive

The day was June 27. On our way to Mara, we stopped at Lake Naivasha for a short boatride, then at a local corn market for a quick snack, followed by lunch, until we reached our camp.



It was late for a game drive, but William and James convinced us to go because, if we were lucky, we could see a kill. As we entered through the gate, we were immediately greeted by a jackal! But James **INSISTED** that we only look out for the big cats that evening.

After thirty minutes of passing by zebras and elephants, we saw a few jeeps circled around something. We creeped up and **THERE WAS THE SOPA PRIDE! OUR FIRST PRIDE OF LIONS!**



Sopa Pride

The Mufasa was sleeping and the lionesses and younger males were snacking on a buffalo that they had killed earlier that day. My brother Riju and my cousin Mishka did not like the sight of the lions eating the dead buffalo. But, my youngest cousin Masha and I were happy for the lions. Even James got busy taking pictures!

After we returned to our lodge and ate dinner, William told us to be ready by 6:30 the next morning. We went to bed right away, excited and ready for the next day.

Day 2: Game Drive, Masai Village Visit

This day was the best day of our entire trip! The lodge packed breakfast for us and we set off again. We drove along the same route and noticed circling vultures. A jeep was in the same place where we had seen the lions the evening before. The pride was still there, devouring the dead buffalo, only this time the Mufasa was awake, alert and watching over his pride. He suddenly got up and went to itch himself by a tree, where he peed to mark his territory. He then walked to the back of our car, where, we thought, he was just trying to scratch his back. But, my grandpa later said that the lion had peed on the back of our car! By then a few other jeeps had arrived and the

Mufasa probably wanted to tell us to stay away from his territory. He went on peeing at the back of five other jeeps next to us until we thought he was done. But then, he walked to a nearby pond, took a long drink, strode to a nearby jeep, and peed on it again. The lion and the lionesses started to roar together, an indication that they were feeling threatened, as William explained to us. So, we backed off from the circle of jeeps and drove on, hoping to find more big cats.



Lion Drinks

As we continued our safari, we came across a group of giraffes. James explained that when the giraffes are standing, they are called “a tower”, and when they move - “a journey”. He then asked us how many neck bones we think a giraffe has. We all made our guesses, thinking that the number will be high as a giraffe has such a long neck. But James said that giraffes and humans have **the same number of neck bones, which is 7**. As we were admiring the giraffes, James got a message on his radio saying that a cheetah had been spotted near an in-park lodge. We sped towards the lodge, but we didn’t see anything there. As William drove off to look in a different area, James slowed down and scanned the bushes. I took out my binoculars too.

But all we saw was an elephant enjoying some leaves. Suddenly, James told us to be quiet because he thought he had heard something in the bushes. He drove around slowly, and there indeed was a cheetah! James informed us that she was called Nashipai. I later found out that she was one of the most famous cheetahs in the Mara and she has been featured in a documentary called **The Last Cheetahs**. James radioed William and he arrived, along with a few other cars.



Nashipai the Cheetah

Our guides thought that Nashipai would be ready for a hunt, but she did not appear to be interested and instead moved into the bushes. William tried to move closer to her but, unfortunately, his jeep got stuck in the mud. James drove his jeep around, and soon we were able to pull them out.

We continued driving, passing Nashipai on the way, gazing idly toward the distant gazelles. We left her to herself and drove on to look for a good picnic spot for our bush breakfast. Soon, we found a good spot on a nearby knoll, overlooking herds of grazing animals.

As we were driving around after breakfast, we saw some topis and gazelles looking up in one direction. James told us that they had sensed a predator nearby. James and William gunned the engines of our jeeps and we sped off to see what was happening. We spotted another cheetah, this one much younger. James told us that she was one of Nashipai's three daughters! I think James said her name was Nempiris. She was getting ready for her hunt and appeared to be aiming for the gazelles nearby. But then she saw us, and disappeared into the bushes. As we were about to give up any hope of seeing a real-time hunt, Nempiris' sister, I think Nasieku, came out of her slumber and walked out of the bushes. James followed her very slowly, asking us to be VERY quiet. He lined up our jeep alongside her, maintaining a safe distance, when we saw Nasieku starting to walk in the direction of the gazelles. The gazelles were still looking up in this direction, but apparently had no idea what to do next as Nasieku was slowly gathering speed. A nearby topi noticed her picking up speed, and ran off, which startled the gazelles. Nasieku was now going at full speed, and James was trying to keep up. What a majestic run that was! Absolutely unforgettable! Suddenly, Nasieku stopped in her path. We all thought that she had given up, because I knew



that cheetahs couldn't maintain their speed for a long period of time. Then, Nasieku moved, and we saw that she had caught something! James and William slowly pulled up to where Nasieku was with her prey, and we saw that she had caught a young gazelle. It hadn't been killed yet. Nasieku just held her prey between her legs as it was calling out. Then, suddenly, she bit the neck of the gazelle, and, just like that, it was all over.

We sat there, silent, having mixed feelings. We felt bad for the young gazelle, but also felt good for Nasieku. We left her to her meal and headed back for the main road, with remembrance of something absolutely unforgettable. Apparently, as we found out later, this was one of Nasieku's first independent and successful hunts, which meant that she had learnt to survive in the wild without the protection of her mother, Nashipai. We felt lucky to have witnessed something so special.

As we pulled ourselves back to the human world, James and William told us that they wanted to take us to **their village**, which was right outside the park. There, we met with the local Masais who showed us what Masai life was like. We saw the Masai men's dance, which Masha and my grandparents joined, while the rest of us admired from a distance. After the dance, we saw the famous Masai jumping. In this, they jump high without bending their knees, and, apparently, whoever jumps the highest can marry the most wives! (We later tried the Masai jump after we returned to our bush camp, but we could barely jump two inches.) After the jumping, we got a tour of the village and the houses. The houses had low ceilings, so I kept on bumping my head. We learned how the Masai made fire and saw the women's dance. We then went to the Masai Market where I bought a beaded bracelet with the Kenyan flag. William had gifted us bracelets with our names and Kenyan flags earlier in the trip, and Masha was gifted with a necklace made of olive seeds and a lion tooth at the village. My mom bought one too. *We then said "olesere", meaning goodbye in the Masai language, and headed back to our lodge.*



Maasai Village

Day 3: Last Day - Full Day Safari, Ilora Visit, KE-TZ Visit

Our Kenyan trip was nearing an end and this was our last day at Mara. We were allowed to sleep a couple of extra hours that morning because we would be starting late and safairing the whole day. We left after breakfast, drove through the park for some time, spotting a cheetah in the distance and a herd of topis and hartebeests. Then, we noticed a few cars driving towards the bushes and followed them. *There was the elusive leopard, hiding in the shade of the bushes, facing away from us.* Then, one landcruiser gunned its engine, which startled the leopard, and it walked deeper into the bushes. But we got our chance to see the last of the Big 5, all thanks to our two amazing and very experienced guides. There was one bad thing that



Leopard

happened though. Off-roading is prohibited inside the park, and you pay a hefty fine if you get caught. As we were leaving the leopard, our jeep was stopped by rangers and James got fined. He said he would deal with that later, but we could tell that he was upset and was not quite himself the rest of the day. We then headed towards the Ilora Retreats, an in-park resort owned by a fellow Bengali, who had invited us to visit his resort. He and his staff welcomed us warmly, offering us one of my favorite meals,

luchi-aloor dum. Then, he gave us a tour of the resort, the tents, the the spa, the skydeck, and the **hippo pool**. I even got a chance to plane-spot because Keekorok Airport was close by. We went up to the skydeck and had an awesome view of the park, seeing elephants and impalas in the distance. We then walked down to the “Stinky” River and saw a bloat of hippos. There was a nearby crocodile as well. We then said goodbye to Ilora and continued on with our Safari.

Our next stop was the Mara River. We headed towards a viewpoint where tourists generally gather to experience the famous Mara River Crossing during the **Great Migration**. Unfortunately, we were a couple of weeks early to experience this.



Hippo Pool

We made a quick stop for a bathroom break and lunch. William told us that we were on the edge of Kenya, and that Tanzania was just minutes away. We quickly ate our lunch and headed towards the border and arrived at the no-man's-land, 2 meters from Kenya and 21 meters from Tanzania! We stood at the border of the two countries, took pictures, and saw cars coming in from Tanzania. Surprisingly, there were no guards, so we could go as far as we wanted, but we didn't risk it in case we got caught.

This would be our last main attraction in the Mara. We headed back towards the lodge, seeing ostriches, zebras, elands, topis, and other herbivores along the way. Then, we spotted a jackal sprinting alongside us. We followed it and noticed a hyena dragging a buffalo's carcass and a vulture waiting patiently nearby. We pulled up next to the hyena, startling it. It looked up, confused. But then, it made a noise, calling for a friend. His friend pulled up, with a jackal close behind. The two hyenas initially pushed the jackal away, but then they decided to let the jackal have her share. The vulture, however, waited patiently for his turn. The jackal then left and the hyenas started dragging the carcass again. The vulture discreetly followed. This was the funniest thing we saw in the entire trip, but it also showed us how everyone follows rules in the jungle and how the ecosystem is balanced. This was the last of our **মারা অভিযান** because we reached the gate about ten minutes later, exiting the park, but carrying the memories of this unforgettable place with us.

After Mara

Our কেনিয়া অভিযান didn't end there! After a full day of driving we arrived back in Nairobi. We explored the city and went on a safari at Nairobi National Park, where we saw a failed lion hunt. We left that same day, saying goodbye to William and James. We had seen the Big 5 and perhaps a lot more than what other tourists could have done on their first Kenyan safari. I will remember this trip, and I really hope we can visit again, perhaps adding more African countries to our new itinerary!



I Am Not Born to be Deaf

Aurkodeep Chanda, Grade 5



In a town called Hanorm, there lived a father who had a boy and a girl. The boy loved his sister and always looked after her. The boy was called Andrei – he couldn't hear but he had a really strong sense of smell.

One day his dad took his sister to school and asked Andrei to cook dinner. He also asked Andrei to pick his sister up after school. The dad had to attend an important meeting in town.

Andrei finished cooking and set out to pick up his sister from school. As he got near the school, he made his way to the pickup area. Suddenly he smelled something ghastly. The smell was coming from a house next to the school. Other parents who had arrived had not noticed a thing about that house.

Andrei walked toward the house and rang the doorbell. No one answered the door. Andrei banged on the door. Still, no one came to the door. His banging caught the attention of a man walking by the house. He was walking his dog. As he heard and saw Andrei banging, he gently pulled at his dog's leash and walked to where Andrei was standing. The man knew Andrei as he had seen Andrei at the grocery store earlier that day.

The man approached Andrei and held his hand. Andrei gasped! He turned around and saw a reassuring and friendly face. Then Andrei saw the dog and knew that he got help. He reached down to pat the dog. Meanwhile, the dog started to growl and became restless. The man realized that something was wrong. He shouted for help. The parents who had gathered around the pickup area at the school turned around and looked toward Andrei and the man. The dog had started to bark loudly by that time. Some of the parents ran towards the house while the others stood at the pickup area, looking at each other.

In front of the house, the people were debating whether to go inside the house or to get the police. One of the parents said that someone should also inform the school and delay dismissal as it could be dangerous. The man suggested no one should go inside the house until the police arrived. He asked one parent to go and talk to the principal and explain the situation to her. In the meantime, the man tried to look inside the house. Andrei took the dog's leash and walked around to the back of the house. He came to a large backyard which had a shed under the deck. The dog started to bark loudly. The men heard the dog and came running.



০২০



Andrei looked at the men and pointed to the shed. Then he started to loudly knock on the door of the shed. No one answered from inside. However, something inside the shed appeared to shake a little. Andrei and the dog found a small hole near the floor under the door. Andrei peeked through that hole. He saw a pair of feet a short distance from the door. Andrei knew the feet! They belonged to his sister! There was a smell as well. He wasn't sure what that smell was, but he realized that the smell was coming from inside the shed.

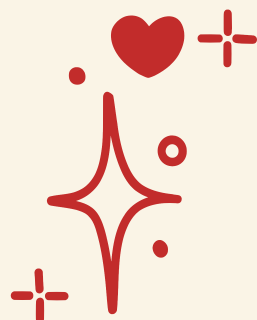
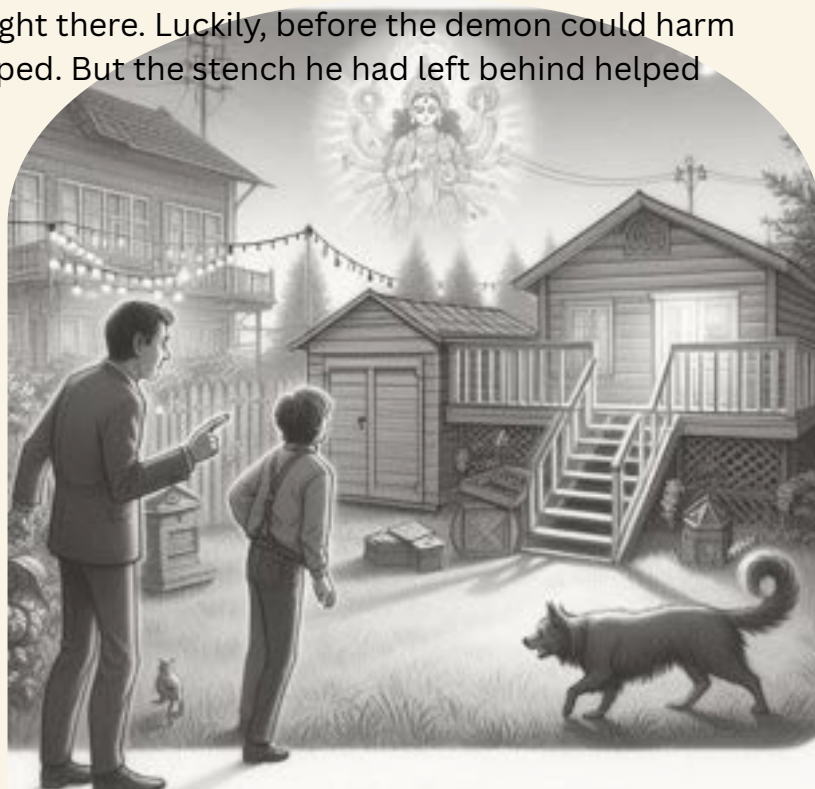
At that moment, the police arrived. The officers noticed the people gathered in the backyard and watching Andrei. The boy appeared very excited and concerned at the same time. Andrei saw the officers standing among the parents. He looked at them and waved at them to come near the door to the shed. Something called out from inside the shed. The officers banged on the door and asked who was there. A weak voice called out, but no one opened the door.

The two officers talked among themselves and looked at Andrei. The boy gestured at them to break the door. The officers agreed. Andrei and the officers broke the door open and ran inside the shed. There, on the floor, lay a little girl with her feet tied with a rope. But her hands were acting crazy! She was flapping her hands, stimming, and did not understand how to call for help. She had autism and could not speak.



Andrei brought his sister home. She was shocked and was feeling very anxious. So, Andrei gave her a good meal and put her in bed. Later in the night, Andrei was thinking about the smell and who was the kidnapper as the police had not yet found anyone or anything in the house that could lead to the kidnapper. Suddenly, there was lightning outside his room and Andrei saw a figure with ten hands and a lion standing there. Andrei stared at them, surprised. Then, a woman's voice spoke. She said that Andrei's sister had followed a woman into that house. The little girl was at recess when she thought her teacher was calling her. She followed that woman and had entered the house. But as soon as they went inside the house, the woman looked at her and slowly started to change into a bull-headed demon! The little girl screamed and fainted right there. Luckily, before the demon could harm the girl, he saw the lion and escaped. But the stench he had left behind helped Andrei save his sister.

Andrei woke up with a jolt and realized that there was no one outside his room. But someone was shaking him. Their dad was back home from work. Andrei thought that he would keep his dream to himself and let the police keep looking for the bad guy.





About the author

Aurkodeep is a ten year old non-verbal autistic boy who communicates and writes by spelling his words on a letterboard.



আমরা সবাই ছিলাম রাজা প্রিয়দর্শিনী

আজকের কি আর লোক আমরা
কেউ বলে বুড়ো তো কেউ আধ-দামড়া
আমরা দেখেছি ১,২,৩,৪,৫,১০ পয়সা
পঞ্চাশ পয়সাতেই রাজা, ছিলো না লালসা
বর্ণা, সুলেখা কালিতে আঙুল করে কালি
পরীক্ষা দিয়েছি, লিখেছি কতকি হবিজাবি ব্যথালি
Blotting পেপার দিয়ে কালি নিয়ে শুষে
কেউবা নিব মুখে নীল কালি নিতাম চুষে

নববর্ষের মিষ্টি? সেতো মাথাপ্রতি গোনা
Amulspray খেয়ে বুঝেছি স্বাদ তার নোনা
বাঘ ভাল্লুক বিস্কুট মশলাতে মাখিয়ে
চার আনার আইসক্রিম খেয়েছি কাঠি সরিয়ে
সবজির খোসা দিয়ে পুতুলের রান্না চড়িয়েছি
সন্ধ্যে হলে হাত পা ধুয়ে পড়তেও বসেছি
গাছের ডালকে তরোয়াল বানিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছি
কেটে গেলে ধুলো মেখে রক্তপড়া বন্ধ করেছি
আজকের লোক কি আর আমরা
কেউ বলে বুড়ো তো কেউ.....থাক আর বললাম না

কাদামাথা রাস্তা, নর্দমা, বনবাদাড় ঘুরে
হেটেছি ছুটেছি আবার গিয়েওছি পড়ে
তাই বলে ভেবোনা টিটেনাস নিয়েছি
লাল mercurochrome এ বাজিমাত করেছি
হোমওয়ার্ক না করলে ছিলো চড়থাপ্পড়
ওটাই তো ছিল বুকোর ধাকরপাকর

মার কাছে ঘ্যানঘ্যান, বাবাকে যম-ভয়
দিদিমনিরাই আসল, google তো গুরু নয়
পয়লা বৈশাখ আর পুজোতে জামা দুটো মোটে
বুঝেছো এবার বয়স আমাদের গ্যাটে গ্যাটে
দোকানের হালখাতার লাইনে দাঁড়িয়ে
মিষ্টি খেয়েছি আমরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে
বড় সুখের আমাদের মধুমাখা স্মৃতিগুলো
ভালো থাকি, যখন ভাবি পুরানো দিনের কথাগুলো
সবাইকে বলছি বেঁচে নাও, বেঁচে নাও এই মুহূর্তে
কি জানি কাল কি হবে কি দেখাবো জগতে...



The Life Of A Troubled Genius: Robert James Fischer

Maitreya Ganguly, Grade 8

The year is 1972. The streets of New York city are crowded with spectators and fans trying to get a gaze of the first American world chess champion, Bobby Fischer. Many Americans of that era knew at least the name of Bobby Fischer, who beat the Russians at their own cherished game bringing glory to the USA in the time of the cold war. A legend of the game, his life outside of chess was certainly not one to be proud of. Upon winning the world championship, Fischer became more and more erratic. He shifted towards christianity, he was sought after by the police, became anti-semitic, and left chess for 20 years. But how did such a prospering legend become completely changed as a human being? Bobby Fischer was a troubled genius because he was a prodigious talent, he achieved the world champion title, and he was very erratic and shifted towards evil.



One reason contributing to Fischer being a troubled genius is that he was a child prodigy. Fischer was born in New York in the year 1943 in Chicago. He had one older sister, Joan. His mother, Regina, worked jobs around the country to support the very poor family as a single mother. Eventually the Family moved to Brookline in New York



city where they lived in a two bedroom apartment. Bobby learned the game in 1949 when his sister brought a chessboard back from a candy store. From that day, the bond between Bobby and the chessboard was created. He spent all day with the chessboard. After joining a chess club so that his mother was assured he was spending time with others,

Bobby's chess skills skyrocketed. He became US junior champion at 13, and US champion at 14. The following year Fischer became a grandmaster, at the age of 15, a record at the time. In this time period he played the "Game Of The Century", a game still analyzed heavily today. But this lack of childhood certainly contributes to Fischer's troubled adult life, in which he created a lot of controversies.

Another reason Bobby Fischer was a troubled genius is because he became a world champion in the year 1972. Fischer represented the USA in many olympiads, and made progress as an individual player as well. He won the 1971 candidates tournament, the tournament for deciding the challenger to the world champion. He even won 20 games in a row against top level competition! To improve his chess knowledge, he even learned Russian to read Russian chess books. Winning the candidates, Bobby earned the right to challenge Boris Spassky, the world champion at the time. But at this time, Bobby's demands for the prize fund of the match were not being met. But then the funding for the match was suddenly increased and Fischer agreed to play the match in Iceland, in Reykjavik as the hosting city. Suddenly tragedy struck, as Bobby lost the first two games of the match in odd fashion. He made beginner mistakes, likely due to the pressure of the match. Bobby complained the cameras were distracting him, and wanted to play backstage with no cameras. Spassky,

being a good sport and a true gentleman agreed to these conditions. Fischer made a massive comeback and won the match in spectacular fashion after Spassky's decision. Upon coming back to New York, Bobby was treated as a hero, and sparked a chess culture in the United States inspiring many. But this world champion title created extra pressure in Bobby's mind. His ego was also boosted, as he now felt that he should get more money to play in tournaments. Fischer shifted from his Jewish background to Christianity, and heavily followed religion and politics slowly losing his passion for chess.

The final reason why Bobby Fischer was a troubled genius is that he became more and more erratic and his mind became twisted. In 1975 he refused to defend his title against Anatoly Karpov, the new challenger because he disagreed with the new rules of the match. Fischer lost the crown, and proceeded to leave chess for 20 years. He played a match against Spassky in 1992 again, in Yugoslavia for a huge prize fund. This however, was illegal for Fischer. He was not allowed by the US to engage in financial activities in Yugoslavia, but refused to listen. He won the match in great fashion, but could not return to the USA as he was now a fugitive. During this time he spent his life in Hungary, and the Phillipines. He even spent detention time in Japan in 2004 because he used an alleged revoked US passport. During this period of his life

Bobby made terrible comments about the US, and even supported the 9/11 attacks. He even supported antisemitism despite his own family being Jewish. Bobby became an Icelandic citizen, and began to live in Reykjavik, the city in which he became world champion. He passed away in the year of 2008 at the age of 64, the number of squares on a chessboard.

Bobby Fischer was certainly not a wonderful human being. He made many crude comments, but one thing is certain, that he was a legendary chess player. Many players today study and analyze his games to become a better chess player, and his grave in Iceland is visited by many chess enthusiasts even today. He was much ahead of his time, preparing before the games very well. He was also an author, writing the book “My 60 Most Memorable Games” published in 1969. The book is considered a chess classic, and advisable for all serious chess players to read. Bobby also created the modern day clock used today in chess games, and he also created Chess 960, a variant of chess that is very unique. Fischer is arguably one of the greatest players of all time, and will continue to inspire players around the globe.



Bibliography:

- Endgame: Bobby Fischer's Remarkable Rise and Fall - From America's Brightest Prodigy to the Edge of Madness
- Wikipedia: Bobby Fischer



Pujo Puzzle

-WITHLOPA



চ		চি	
---	--	----	--

Adventure in Patagonia:

Memories from my backpacking trip



Shaunak Sasmal, Grade 8

All began with a story – one my dad told me over and over again, about a place so remote and beautiful that it never left his mind and soon became a part of mine. As we closed in on the turquoise blue lake in front of the jagged peaks, I knew that this trip had been worth it. The aching muscles, the sunburnt skin, and the weight of a 30-pound backpack all went away as the breathtaking view of the Torres unfolded before me. It was more than just a hike – it was a journey of discovery, not just through one of the most beautiful places on Earth, but also through the stories and connections shared along the way with fellow hikers. This adventure took me to the Torres del Paine National Park in the Andes in the heart of Chilean Patagonia – and left me with memories I'll never forget.

Our journey began in Santiago, the capital city of Chile. From Santiago we flew to the small port city of Puerto Natales, entering Patagonia's rugged, mountainous terrain. A stark contrast to the bustling capital, Puerto Natales serves as the gateway to Torres del Paine, where we'd be hiking for the next five days.

We hopped on a bus and after three hours reached the park. I was awestruck by the beautiful mountain ranges, massive glaciers, winding rivers and a bountiful number of glacial lakes.

"Torres del Paine" translates to "Towers of Blue" in English. This name likely refers to the blueish hue of three massive granite towers, the centerpiece of the national park.



The bus dropped us off, and we took a ferry across Lake Pehoé. On the ferry, we got a glimpse of what our journey would hold in store for the next few days. We saw two massifs: The iconic Torres del Paine and the Cuernos del Paine (also known as the Horns of Paine), with dark, horn-like formations atop light gray granite cliffs. The ferry took us to camp Paine Grande, and I was very eager to begin the hike.

The hiking trail is shaped like the letter W and goes around the two massifs. There is also a longer version (8-10 day) of the trail that connects the two ends of the “W” and is called the “O” trail.



Bus that took hikers from Puerto Natales to Torres del Paine National Park



Ferry ride on Lake Pehoé overlooking two massifs



W and O trails around two massifs

The hiking trail is shaped like the letter W and goes around the two massifs. There is also a longer version (8-10 day) of the trail that connects the two ends of the “W” and is called the “O” trail.

It was so windy at Paine Grande that tents were nearly flying away! After setting up ours, we headed to the community kitchen, where hikers gathered to cook and share meals. We used our portable stove to boil water that we poured in our freeze-dried food packets. Within minutes our dinner was ready, and we enjoyed a filling meal. The food in the packets is so dry that some have a shelf life of 40 years! Over dinner, we met with many people from different parts of the world, and we shared our hiking experiences and backgrounds.

The hiking trail is shaped like the letter W and goes around the two massifs. There is also a longer version (8-10 day) of the trail that connects the two ends of the “W” from the other side of the massifs and is called the “O” trail.



After a good night's rest, we got ready to head out on our first day of hiking. We were going to a glacier called Glacier Grey. The trail took us through beautiful valleys full of flowers, waterfalls and streams.



The trail went past a lake called Lago Grey that is fed by the Glacier Grey. As the glacier grinds rock and sediment as it moves, these particles get released in the lake, giving it its grey hue, likely from an abundance of magnesium. The glacier was taking a sky bluish tint, caused by how the ice reflected light. Large ice chunks were drifting past us, having been broken from the glacier. The view was simply amazing!



Glacier Grey overlooking Lago (Lake) Grey; dad almost lost his step in the gusty winds

After getting our moments in with the glacier we headed back. The first day was an exhausting 14 miles of hiking. After having dinner, we sat down for a few minutes admiring the beautiful golden rays of the setting sun that fell on the peaks of the massifs. There was light until 10:30pm.

As the morning light broke through the tent, we rose from our slumber. We packed up all our stuff and headed for the next camp called Camp Frances. It was Christmas Day, so everyone was greeting each other with Merry Christmas. At about 7 miles, this would be the shortest hike of the whole trip. On our way, we could even see some snow, although it was summertime!

At Camp Frances, we were happy that we did not have to set up our own tents. There were pre-set tents that were elevated on platforms with ladders and much larger than ours. We arrived early at Frances, so we decided to relax for a while. After a while, we

saw a crowd gathering – two hikers hadn't arrived at Camp Frances, and the others, concerned, alerted the rangers. They likely took a side hike and arrived late, but it was heartening to see strangers looking out for each other. The next day, we experienced the same kindness: after arriving late, fellow hikers who had passed us earlier expressed relief that we made it safely.

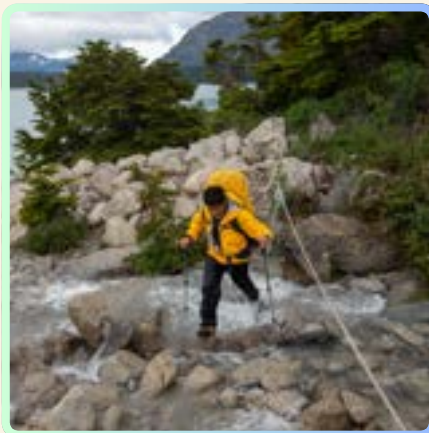
After having our dinner, we went to bed early so that we could have an early start to the next day, which would be the longest day of our trip. While trying to sleep, we overheard a young couple arguing in Bengali! Jokingly we called out, “এই ঝগড়া করে না, ঝগড়া করে না...”. Out came a big laugh from the other side and with a response “এখানেও বাঙালি আছে!”.



Setting sun casts a golden hue on the mountains

The next morning, we headed to Camp Chileno, the park's nicest camp with views of the Torres. We aimed to arrive by 6 pm for our booked dinner – the last night in the park. The hike began the elevation gain toward the Torres and passed near the Cuernos del Paine (Horns of Paine), a unique set of peaks formed over millions of years when light sedimentary rocks deposited over dark granite rocks. Over the years due to glacial activity upper portions of the sedimentary rocks eroded to expose the dark horn-like formations atop the light gray cliffs.

We even crossed a couple of streams on our feet and filled up our water bottles. These streams were flowing water from the peaks to Lago Nordenskjöld, a very beautiful lake known for its milky blue-green water. This unusual color is due to the color of minerals in the finely ground rock powder suspended in the glacial meltwater.



This day was pretty hard for me. I felt like the hike just kept going on and it would never stop. We went through many different terrains, including a bit of desert, shrubland, and even a burnt forest! In 2011, a hiker ignited a fire by burning toilet paper that destroyed almost 44,000 acres of forest.

By far, my favorite was grassland. There were a superfluous number of flowers and they made beautiful sheets of yellow and white.



After a while we reached a point where the path turned orangey-brown and we realized we were hiking along a gorge formed by a river that flowed from the Torres. The uphill began. This part was only about 1.5 miles, but it just kept on going. I was already exhausted from around 8 hours of hiking by now with my heavy backpack, but my dad kept me motivated to keep on going as we needed to

reach Chileno by 6pm. When we stopped for a short break, we could hear the ground shake. Was it an earthquake? No, it was a man on his horse along with two other horses, doing a supply run to Camp Chileno.

Finally, when we arrived at Camp Chileno, I breathed a sigh of relief. It was an exhausting day, hiking for about 12 miles for 10 hours up and down the mountains with about 30 lbs on my back. We arrived just in time for dinner, and I was ready to eat! It was a family style dinner with 10 people seated at each table. It was such a good experience meeting and interacting with people from different countries, and sharing our experiences of hiking in the park and other parts of the world.



Horses that carry supplies to camps

For dinner we got a 3-course meal: first we got a salad which was pretty good, next we were served Chilean Salmon, which was probably the best salmon I ever had, and finally a dessert which was sort of a crumble cake with local berries that was delicious.

After our lavish meal, we settled into another elevated tent, this one beside the scenic Rio (river) Ascencio, fed by snowmelt from the Torres. I was excited for the next day's climb to the Base de las Torres – the highlight of our trip.

I woke up to the gentle sound of Rio Ascencio. I was eager to start our last day's hike and the most important one. After having a quick breakfast, we began our hike. The

distance to the top of a little over 3 miles was not much, but it was very steep, and rocky, so it took some time. It was also very exhausting under the hot sun. At high elevations the sun's rays feel more intense as there is less atmosphere to filter UV rays.



Camp Chileno by Rio (River) Ascencio

Finally, when I reached the top, it felt my whole journey was well worth it. In front of me stood the three grand towers with a beautiful lake in front of them. The turquoise blue water with the reflection of the three towers really made the place seem magical. Everyone was taking pictures on a big rock and so did we. We even saw a person proposing to his partner on the rock. We sat down to have some lunch, which we brought along. After taking in the view of the Torres, we sadly had to go back down.

We arrived at Camp Chileno, where we collected our backpacks that we left at the start of our hike, and continued our descent. The hot sun was very hard to deal with, with almost no shade due to lack of trees throughout the trail. Finally, we reached Hotel Las Torres, where we would catch a bus back to Puerto Natales. There we met an Indian person who lives in California. He mentioned that he was 64 years old, but his age did not deter him from hiking the 8-day "O" trail! Incidentally, he was going to the same hostel in Puerto Natales that we were going to stay at. At Puerto Natales we had dinner together and he encouraged me to continue hiking. He told stories of how he got both his daughters into hiking when they were young, and they in turn led hiking tours for their school and college friends.

This may have been the end of my hiking journey, but it was not the end of my trip. The next day we took a bus from Puerto Natales to El Calafate, a small town in Argentina. On the way we crossed the border from Chile to Argentina, which itself was quite an experience. There were no boundaries, no gates, no police, just a small house in the middle of the road where they processed our entry.

My mom joined us at El Calafate and the three of us visited many places in Argentina and Brazil, as regular tourists. Although we visited three amazing countries, I would say that Chile was the most memorable part because of Torres del Paine. Overall, while I really enjoyed the beautiful mountains, glaciers, lakes and streams, what really made the trip memorable was the stories, friendships, and moments



I had with others, exchanging our experiences, learning from other cultures, and the constant encouragement that I received all along the trail.

I was probably the youngest person on the W trail in those days. Even though we were all strangers at the beginning of the hike, at the end of the trip it felt like we were all part of a family. For me, this is the best thing about hiking, no matter who you are or where you are from, you will always be welcomed.



Hello!

My name is Jodi Barmash
NOT JUST AN AGENT
YOUR LOCAL REALTOR® AND ALSO
your neighbor!

Whether you're thinking about buying or selling soon or just curious about your home's value, I've got you covered with a **complimentary market analysis** — or a **complimentary Buyer consultation**.

I look forward to speaking with you!
323.376.6545 | jodi.barmash@raveis.com
Follow me on Instagram @[jodibarmash](https://www.instagram.com/jodibarmash)



WILLIAM RAVEIS
1713 Massachusetts Ave, Lexington, MA 02421



**Lights are twinkling, dhaaks are loud,
Pujo's coming - join the crowd!**

This year, I came to Kolkata for the first time to celebrate the pre-Pujo days - and wow, it's even more exciting than I imagined! The city is so busy and happy that it feels like it's smiling at me.

One morning, we go to Kumartuli. I see artists making Maa Durga from clay. Her hands, her crown, her eyes - all slowly coming alive. I stand there with my mouth open. It's like magic!

Another day, we go shopping in Gariahat. What a crowd! I see saris in bright reds and greens, shiny bangles, and shoes that sparkle. Maa buys me a brand new punjabi and payjama. Baba buys me Kolkata's famous Bedouin egg-chicken roll - warm, soft, and so tasty that I don't want to share! Darun! (Awesome!)

At night, I hear dhaak beats in the streets near our house at Behala. Our para is famous for its big Durga Pujo and wins an award every year! Fairy lights blink everywhere, and I even see white shiuli flowers on the ground, which I pick up to keep in my pocket.

Pujo hasn't started yet, but the whole city feels ready. My first pre-Pujo in Kolkata is full of sounds, lights, sweets, and smiles. Now I know - here in Kolkata, Pujo is not just a festival... it's a feeling from the heart!

Lights and colors fill the air,
Pujo's coming - joy everywhere!

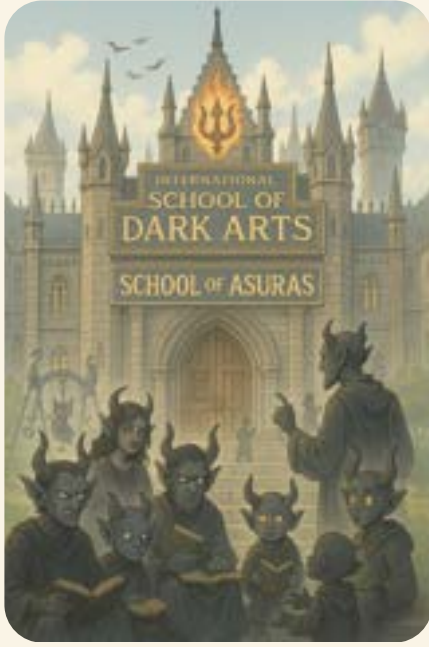


অসুরের স্কুল

দ্বিতী চৌধুরী (Age 7)

এক সময়, যখন দেবতা রা স্বর্গ শাসন করতেন এবং Demons রা নরক শাসন করতেন, তখন Demons এর রাজা Rambha এর একটি promising পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সে দ্রুত বড় হচ্ছিলো। কিন্তু যতই সে বড় হচ্ছিল, ততই সে Arrogant হয়ে উঠছিল। তার বাবা-মা তাকে best school এ ভর্তি করার decision নিয়েছিলেন, International School of Dark Arts।

তার প্রথম দিনে, demon রাজকুমার লন্ডনে একটি flight নিয়েছিলেন, যেখান থেকে তিনি একটি car নিয়ে nearby station এ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁর একটি train ধরার কথা ছিল। তিনি platform 9 3/4 খুঁজছিলেন। Search এর সময়, তাঁর অন্য এক demon, Voldemort এর সাথে দেখা হয়। তারা দু'জনে একসাথে হাসাহাসি এবং joke করতে করতে শেষে প্ল্যাটফর্মটি খুঁজে পান। তারা একটি দেয়ালের মধ্য দিয়ে দৌড়ে যান - কিন্তু যখন demon prince ভিতরে ঢোকান চেষ্টা করেন, দরজাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি আটকে পড়েন।



এর পর তিনি একটি পরিকল্পনা করেন। হ্যাঁচকা টানে তিনি magic wall এর একটি পাথরের টুকরো ভেঙে নেন। তিনি Voldemort এর চিংকার শুনতে পান। নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, রাজপুত্র সেই গর্তের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে platform এ আসেন। তিনি দেখতে পান যে Hogwart Express ছেড়ে যাচ্ছে এবং International School of Dark Arts Express এসে পৌঁছাচ্ছে। যখন তারা পৌঁছালেন, তারা খুব ক্লান্ত ছিলেন। কিন্তু Midnight-এ, Voldemort চুপিচুপি রাজপুত্রের ঘরে ঢুকলেন।

"Prince," Voldemort ফিসফিস করে বললেন। "তোমার নাম Mahishasur হওয়া উচিত। তুমি একটি মহিষের চেয়েও শক্তিশালী।" Prince এতে সম্মতি জানালেন। পরের দিন, প্রথম ক্লাস ছিল professor Shukracharya এর। তিনি একজন strict, বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন, যিনি একটি মোটা, magic লাঠি হাতে রাখতেন এবং তার লম্বা দাড়ি ছিল। তিনি তাদের বাহন বেছে নিতে বললেন। আগের রাত দেরি করে ঘুমানোর জন্য Mahishasur দেরিতে ঘুম থেকে উঠল, তাই তাকে remaining কয়েকটি বাহন থেকে মহিষ বেছে নিতে হল।

সেই সময়, সব পশুই দুধের মতো সাদা ছিল। শুক্তাচার্য তাদের নিজের মন মতো color করে নিতে বললেন। মহিষাসুর তার বাহনকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য একটি Red রং এর বালতি বেছে নিলেন। মহিষ টি লাল রং এর হয়ে গেল। কিন্তু মহিষাসুর এর লোভ আর arrogance জেগে উঠলো। তিনি নীল এবং হলুদ রংও চুরি করে নিলেন। মহিষাসুর চেয়েছিলেন তার মহিষটি যেন world সেরা হয়, তাই তিনি সেটিকে প্রতিটি রঙের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। তারপর থেকে, মহিষ কালো হয়ে গেল। Next কিছু বছর মহিষাসুর কে অনেক subjects পড়তে হয়ে ছিল, যেমন weaponry, flying mounts এবং shape-shifting। এই দক্ষতাগুলো master করার পর, তার শেষ পরীক্ষা ছিল Meditation। তিনি Brahma কে mentor রাখলেন। যখন তিনি পাস করল, মহিষাসুর তার স্বপ্ন পূরণের সিদ্ধান্ত নিলেন - সারা বিশ্ব শাসন করার। এরপর কী ঘটে তা আমরা সবাই জানি। মহিষাসুরের অহংকার এবং লোভই দেবী দুর্গার রূপ ধরে তার বিনাশ ডেকে এনেছিল।

MAHISHASHUR ACADEMY OF SOCIAL SKILLS (MASS)

Mayukh Gupta, Age 10

"BREAKING NEWS !! BREAKING NEWS !! The Mahishashur Academy of Social Skills (MASS) is officially launching this Pujo !!" announced the spokesperson of Kailashville. Now that is exciting news indeed. For all of you who do not know what MASS is, here is a cool sneak-peak at the life of an Ashur at MASS.

At MASS, the Ashurs will have 5 teachers. Saraswati thakur, Lokkhi thakur, Ganesh thakur, Kartik thakur and the legend herself – Maa Durga. Ma Durga is not only a teacher - but she is also the principal of the school as well. She is very strict and all the Ashurs are afraid of her. Saraswati Thakur handles the studies and examinations at MASS. She teaches the young Ashurs subjects like Maths, Literature, Robotics, Singing and other exciting things. Her aim is to ensure that every Ashur learns something good and worthy rather than doing evil stuff. Lokkhi thakur teaches the Ashurs how to manage their pocket money. She tells them how to save money and spend them only when necessary. In this way the Ashurs will learn how to save for their future. Ganesh thakur teaches them the skills of healthy cooking so that the Ashurs can become self-sufficient in their lives and stay fit. He also teaches them wise things and good virtues of life. Kartik thakur teaches them sports to stay fit and martial arts to fight off any bad people that try to attack them. Kartik Thakur also grooms the Ashurs so that they look good and handsome. Every month they go to the salon at MASS to style their beard and moustache. Afterall, they should look cool too. Ma Durga oversees the progress of all the Ashurs. She teaches them good manners, sober behaviour and respect.

The Ashurs are very afraid of Maa Durga. They do not dare to disobey her orders. The story at MASS begins with a young Ashur named Badashur (Bad Ashur) who has been doing a lot of mischief recently. He does not listen to his parents, always fights with his friends and harms other people. All the residents of his neighbourhood are fed up with him. They have been thinking of a way to mend his ways and make him good. Finally, the news of MASS opening before the puja brought a sigh of relief. Badashur's parents thought that finally he will become a good boy.

Badashur, being his usual naughty self, thought of continuing all his mischiefs at MASS too. His first class with Saraswati Thakur was on Maths. Badashur, along with the other Ashurs sat in the class. Badashur was very impatient. He just wanted to go out of the class. The moment Saraswati Thakur started to teach, he shouted, " I want to be evil. I do not want to learn these silly subjects". Saraswati Thakur tried to explain to him that he can choose

some other exciting topics like Robotics or Literature or Singing, but alas! Badashur was adamant. He would not study so he started throwing the study materials everywhere. He ran out of the class and went to the room where Lokkhi Thakur was teaching. Lokkhi thakur welcomed him and asked him to sit. She was teaching the other Ashurs how to prepare a budget and spend money wisely.

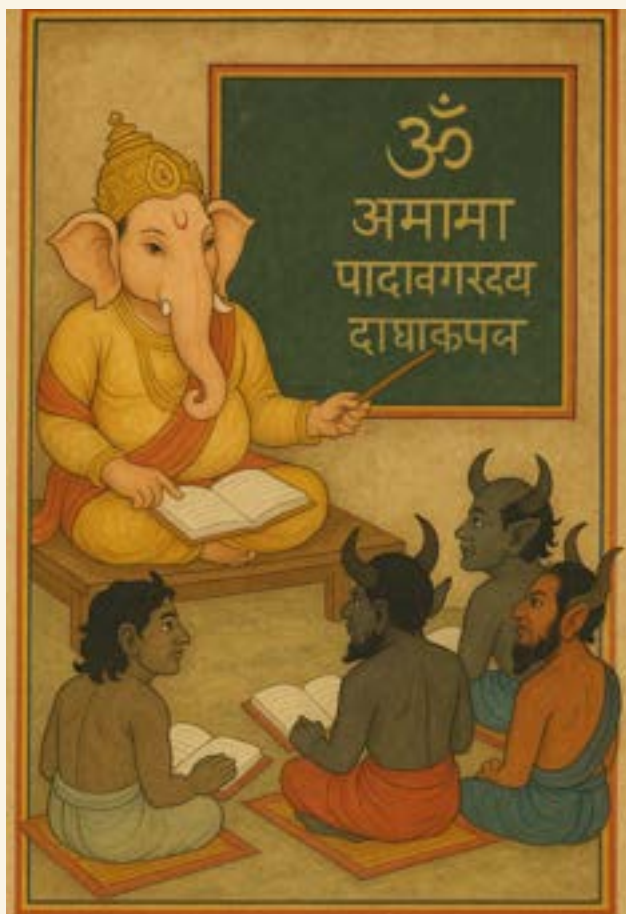
Badashur blurted out, "How boring!! Who wants to save money like this? I will buy whatever I want. I do not want to save". Lokkhi thakur tried to explain that one has to learn the value of money and wealth in life to be successful. But Badashur did not pay heed. He just started messing up with the excel sheets and turning off the computers around. Just as he was going along with his tantrums, he smelt something nice was cooking nearby and ran out to the kitchen where Ganesh Thakur was teaching the fellow ashurs how to prepare a healthy Caesar salad and strawberry smoothie. Badashur was so annoyed to see all the healthy food on the table. He demanded, " Where are the pizzas and burgers? I want mutton biryani and kebabs" Who eats such bad tasting food!!". Ganesh Thakur told him that one should not disrespect food. One should feel lucky enough to get some food daily and one should not show any tantrums for food. But Badashur would not listen and with that, he started hurling the food on the ground. Ganesh thakur and the other Ashurs worked hard to prepare the food and they were very sad to see their efforts wasted. Clearly, Badashur was not liking this school so far. He ran out on the ground where Kartik Thakur was teaching karate to the other kids. Badashur was outraged at seeing this. He screamed, "I do not want these ridiculous sports!!! I want to do evil things. Let me out of this school!!!!". Kartik Thakur tried to explain that one will not become good in life if they do evil and hurt others. But Badashur did not listen, and he started to run amok.

All this while, Maa Durga was sitting at her desk in the principal's room and checking her emails. But her third eye was fixed on the security camera, and she saw all the nuisance Badashur was doing in school. She was furious. She got up and stormed out of her room riding her pet lion and reached the ground.

Seeing her angry eyes, Badashur froze. He started to tremble seeing Ma Durga's fury. Badashur stammered and asked Maa Durga," Hhow Hhow d-did you c-come h-ere? D-did yyou ssee w-what I d-did?". Before Badashur could utter anything more, Ma Durga grabbed him and said," Because of what you did, you will not be able to be with your friends, no one will talk to you, and you will not be able to learn anything. You will only be given daal and bhat to eat and this punishment will last for 6 months". Badashur started weeping and realized his mistakes. But it was too late. The punishment had already begun.

6 months later...

Badashur's punishment is over, and he has learned a valuable lesson. He has completely changed himself. He does not do evil things anymore. He shows respect to one and all and never throws tantrums. The time at MASS has changed Badashur forever. He is now one of the most loved and popular students at MASS. They all call him Goodashur (Good Ashur) now.



Moral of the story:

One should always be content with what one has. Longing for more material things in life is bad. He was given many options at MASS, but he was not satisfied. He wanted to do evil things. He did not show self-control and did not show respect to others. He did not follow rules and wanted things as per his wish. Things do not work out that way. So, this pujo, please keep in mind these 3 things. First, every action has either a positive or negative consequence. If you do bad things, at some point you will have to face the results. There is no way you can get away with misdeeds. Second, always be content with what you have.

Do not be greedy for more things. And finally, have self-control. If you always keep moving around or start throwing tantrums whenever you feel like it, you are not showing self-control. You need to resist the urge to move around like crazy all the time. So, if you keep in mind these three things, you will not suffer any bad consequences. We worship Ma Durga because she got rid of a demon who could have destroyed the world. That had a positive consequence on us. We can also do this ourselves by telling other bad people to try not to do bad things and try to mend their ways. Evil has no place in the world. Stay happy and lead a peaceful life. So that's it. Happy Pujo everyone!... And remember the 3 things that I told you.

TECH UPDATES

AMARTYA HALDAR,
GRADE 6

We're in the year 2025 and technology is rapidly advancing, and it is important to stay up to date with the world's newest tech innovations. That is why I will share with you 3 of the coolest tech innovations in the past 5 years.



1. Neuralink

Neuralink is a company founded by Elon Musk in the year 2016, its aim is to create brain computer interfaces (BCIs). The project initially started as a medical cause to help patients with paralysis might eventually redefine our learning and memory in the decades to come.

The first patient to receive a Neuralink chip called "Telepathy" was Noland Arbaugh, a 30 year old man who became paralyzed neck down during a swimming accident. After many years of waiting in his parents house needing their help to perform even the most trivial tasks, Noland got the opportunity to have a chip implanted in his brain by Neuralink.

In January 2024 he underwent brain surgery to have the chip implanted in his brain. After the surgery Noland could easily move a cursor around a computer just by thinking about it. But there were some challenges post operation which I bet Neuralink is improving on. This may seem a long way off from Musk's final goal of telepathic communication, but it shows how far we have come.

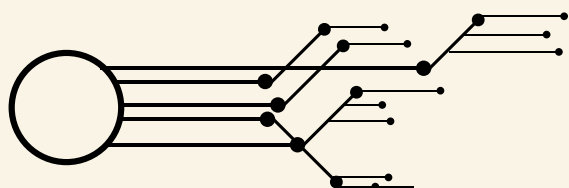
2. Insilico Medicine

Is a company founded by Alex Zharonkov in 2014. This company's goal is to use AI to make drug discovery faster and more efficient with their all in one platform called Pharma. AI which has knowledge about biology, chemistry, and clinical development. With this new possibility drug discovery could advance to a whole different level.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis is a severe lung disease that progressively impairs lung functionality and affects about 5 million people globally. With a median survival of only 3 to four years, current medications are only able to slow down the progression and unable to stop or reverse it.



This is where Insilico Medicine’s AI powered drug discovery platform comes in. Based on a large dataset with information about biology, chemistry, and clinical development, their platform called Pharma. AI helped discover a small chemical compound that could help with the disease. Once certified, the drug showed promising results with an improvement in lung function for patients with a higher dose. Using AI significantly sped up the process of drug discovery reducing the duration only to about 18 months.



3. Smart Contact Lenses

The final amazing technology I want to share with you is smart contact lens. Here are some possibilities in the near future of contact lenses.

- Allergy Relief

Around 40% of Americans have allergies that affect their eyes and they know how it feels to have itchy or watery eyes. To solve this, you can add antihistamine ketotifen to the lens to help relieve any allergies.

- Color Enhancing

Around 15 million people in the US suffer from color blindness. To combat this there are contact lenses that correct color blindness. But, these contacts are not yet customized to the wearer and the customizable ones are in development.

- Magnifying Contact Lenses

Another cool development in the world of smart contact lenses is magnifying contact lenses. A prototype of this has been created and it can switch between normal and magnified vision. The lenses which are only 1 mm thick, have mirrors inside them to form a telescope within the lens. These contact lenses can also help people with low vision which is a visual impairment that can’t be corrected using glasses or surgery. The world is moving really fast with new developments in the various fields of science, so stay tuned for more discoveries.



Credits: <https://neuralink.com/>, <https://insilico.com/>, <https://www.contactsdirect.com/smart-contact-lenses>

রসগোল্লা

প্রবাসীর
রান্নাঘর

রসগোল্লা শুধুমাত্র একটি মিষ্টি নয়, এটি বাঙালির মিষ্টিপ্রেম এবং আতিথেয়তার প্রতীক। আজ প্রবাসীর রান্নাঘরে আমি শেয়ার করছি সেই মিষ্টিপ্রেম 'রসগোল্লার' রেসিপি।

উপকরণ:

- ১ গ্যালন (৩.৭৮ লিটার) দুধ (Whole milk)
- ১/২ কাপ white cooking ভিনিগার
- সাড়ে তিন কাপ চিনি
- সাত কাপ জল

প্রণালী:

- প্রথমে দুধ একটি বড় পাত্রে বসিয়ে মাঝারি আঁচে গরম করুন। দুধ ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে দিন।
- এবার একটি বাটিতে আধ কাপ ভিনিগার ও আধ কাপ জল ভালো করে মিশিয়ে নিন। ধীরে ধীরে এই মিশ্রণটি দুধের মধ্যে ঢালুন আর নাড়তে থাকুন।
- অপেক্ষা করুন। দেখবেন দুধ থেকে ছানা কেটে হালকা সবুজ রঙের জল আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ছানা পুরোপুরি কেটে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মনে রাখবেন, ছানা বেশি ফোটাবেন না, তাহলে রসগোল্লা শক্ত হয়ে যাবে।
- এবার একটি পাতলা সুতির কাপড় বা গামছা দিয়ে ছানা ছেকে নিন। ছানা ছেকে নেওয়ার পর জল ঝরানোর জন্য এটিকে সারারাত রান্নাঘরের কোনো কল বা উঁচু জায়গায় ঝুলিয়ে রাখুন। (আমি আমার রান্নাঘরের কলে ঝুলিয়ে রাখি, এতে সুবিধা হয়।)
- পরের দিন সকালে ছানা নামিয়ে নিন। দেখবেন, ছানা একদম ঝরঝরে আর জমাট হয়ে গেছে। এবার ছানাটা হাতের তালু দিয়ে হালকা করে ২-৪ মিনিট মেখে নিন। খুব জোরে চাপ দেবেন না, ছানার তেল বের হয়ে গেলে রসগোল্লা নরম হবে না।
- এবার হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। ছানা থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে হাতের তালুতে ঘুরিয়ে মসৃণ গোল বল তৈরি করুন। মাঝে মাঝে হাত ধুয়ে নিলে বলগুলো আরও মসৃণ হবে। খেয়াল রাখবেন, বলের গায়ে যেন কোনো ফাটল না থাকে। ১ গ্যালন দুধ থেকে প্রায় ২৮-৩০টি রসগোল্লা তৈরি হবে।
- এরপর একটি বড় পাত্রে সাত কাপ জল এবং সাড়ে তিন কাপ চিনি মিশিয়ে সারা তৈরি করুন। সারা ফুটতে শুরু করলে ছানার বলগুলো সাবধানে একে একে রসে ছেড়ে দিন। মনে রাখবেন, রসগোল্লাগুলো ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে, তাই পর্যাপ্ত বড় পাত্র ব্যবহার করুন।
- এবার ফুটতে শুরু করলে মাঝারি আঁচে ৭ মিনিট এবং তারপর আঁচ কমিয়ে আরও ৫ মিনিট ফুটতে দিন। এরপর গ্যাস বন্ধ করে দিন।
- নরম তুলতুলে রসগোল্লা খেতে হলে, রসগোল্লা অন্ততপক্ষে ১২ ঘণ্টা রসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন, তার পর পরিবেশন করুন।

এই রসগোল্লা দিয়েই হোক না এবারের বিজয়ার মিষ্টমুখ

পত্রলেখা

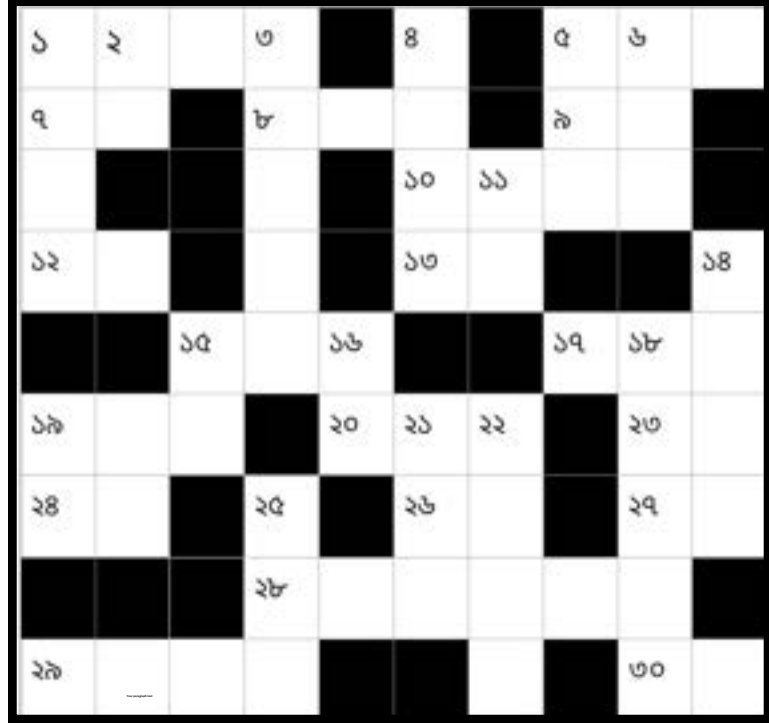


শব্দচক্র

ঐশ্বেয়ী সেন

পাশাপাশি

১ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই দণ্ড পেতে হয়েছিল ৫ প্রামাণ্য জিনিষ ৭ সঙ্ঘ, সমিতি বা দলবদ্ধ কোনো সংস্থা ৮। চুরি করা ৯। দুইয়ের পরে ১০। নদীর জলে হঠাৎ সব তছনছ হয়ে যাওয়া ১২ একই রকম ১৩ সাধ, ইচ্ছে ১৫ বউ বা স্ত্রী সংস্কৃতে ১৭ গৌয়ার --- ১৯। উৎপত্তি স্থান ২০ গুচ্ছ ২০। প্রবাল। ২৪। খারাপ ২৬। পুরুষ ২৭ গোষ্ঠী ২৮। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জল পরিবহণে ব্যবহৃত ২৯ নতুন পাতা ৩০। রাম তনয়



উপরনিচ

১। মহাকবি ২। মানুষের বিশেষ অনুভূতি ৩ যে সহ্য করতে পারে ৪। রামের যে শাস্তি হয়েছিল ৫। মেধা ৬। কাব্যলোকের প্রেয়সী ১১। বাঘের অস্ত্র ১৪ কৃষ্ণের আরেক নাম। ১৬। ভয় পাওয়া ১৮। খারাপ সময় ১৯। গরমের ফল ২১ বনে যা জন্মায় ২২। যা করতে হবে ২৫। যা থামানো যায় না

Answer on page 64



Pujo Puzzle

-WITHLOPA



		র		লা
--	--	---	--	----



কচিকাচাদের আঁকা



PRADYUMNA BASU, 11 YEARS



RITVIK GHOSH, 14 YEARS



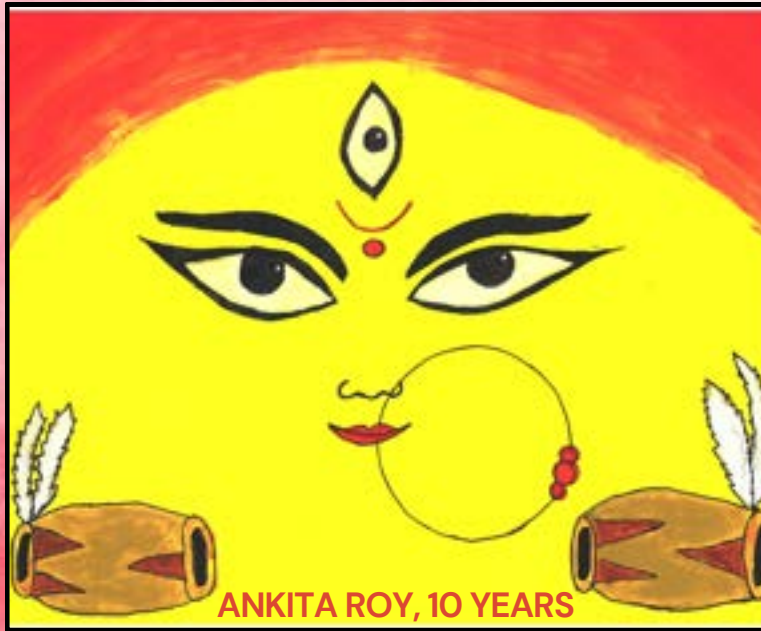
AADRIT SANTRA, 8 YEARS



MAYUKH GUPTA, 10 YEARS



ARISHA GHOSH, 11 YEARS



ANKITA ROY, 10 YEARS



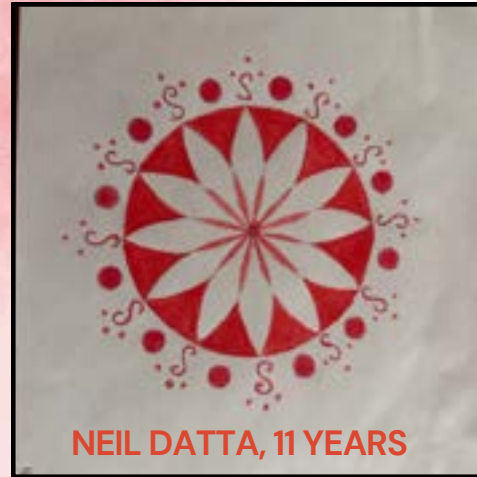
SHOMILI GHOSH, 13 YEARS



NYRA ROY, 5 YEARS



REYA GHOSH, 10 YEARS



NEIL DATTA, 11 YEARS

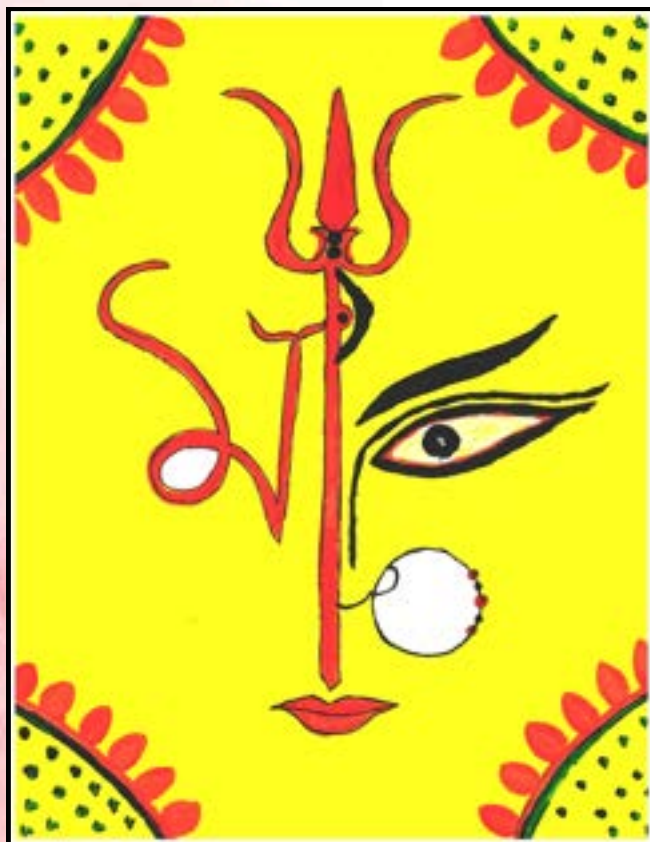


AKIRA MAZUMDER, 5 YEARS



DRITI CHOUDHURY, 7 YEARS

ARCHISHA NIYOGI, 13 YEARS



ANISH ROY, 10 YEARS



MEGHNA DATTA, 13 YEARS

DURGA PUJA 2024



শুভ শারদীয়া









PICNIC 2025

BOSTON RISE CAPITAL

BETTER THAN STOCKS INVEST IN APARTMENTS

We're a physician and a tech executive who were once just like you. Real estate changed everything — join the movement toward financial independence.

Come join us in the movement to gain financial independence!!

- ✓ **Passive investment — no landlord headaches**
- ✓ **Double-digit returns with powerful tax savings**
- ✓ **Use retirement funds (401k / 403b / IRA) without penalties**
- ✓ **Close to 0 taxes on gains with long-term wealth growth**
- ✓ **Outperforms stocks, driven by steady housing needs**



DEB DAS, MD



NAREN ROY

bostonrisecapital.com

919-522-3450

bostonrisecapital@gmail.com



Please call for accurate tax preparation, professional services and consulting.

- **TAX PREPARATION & PLANNING**

Individuals, landlords, business owners, tax issues if earning in foreign countries

- **CONSULTING & SEMINARS**

Resolve audit issues, selection of business entity LLC, S-Corp, Partnership, and Declaration of assets in foreign countries

Passionately dedicated to serving the community



SATYA B. MITRA

Ph.D., E.A., CFP®

Enrolled Agent | Certified Financial Planner™

satya@thegurutax.com

SERVING THE COMMUNITY FOR OVER 33 YEARS

BY APPOINTMENT ONLY, CALL NOW TO RESERVE!

446 Main St., 16th Floor, Worcester, MA 01608

Ph: 508.797.0005 Cell: 508.641.8441